মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকারেজ

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

১. ভিকারেজ থেকেই গল্পটা শুরু..........2
২. পুরো ঘটনাটা..........43
৩. লরেন্স রেডিং পৌঁছানোর পর..........70
৪. তিন মহিলার চিঠি..........119

১. ভিকারেজ থেকেই গল্পটা শুরু

০১.

ভিকারেজ থেকেই গল্পটা শুরু করা যাক।

সেদিন দুপুরে খাবার টেবিলে খেতে বসেছি আমি, আমার স্ত্রী গ্রীসলডা আর ভাইপো ডেনিস।

নানান প্রসঙ্গে গল্প হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে বললাম, কর্নেল প্রথেরো বড্ড গোলমাল বাঁধাচ্ছে। ও যে ব্যাপারে থাকে তাতেই গোলমাল বাঁধায়।

ডেনিস বলল, বুড়োটা বড্ড অহঙ্কারী গোঁয়ার। ওই স্বভাবের জন্যই মনে হয় আগের বউটা তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

গ্রীসলডা বলল, কি হয়েছে বল তো। তোমরা দেখছি লোকটার ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা।

আমি বললাম, চটা কি বলছ, কর্নেল প্রথেরোকে যদি কেউ খুন করে তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর একটা বড় কাজ করবে।

ছুঁড়ে ছুঁড়ে না বলে, মোদ্দা ব্যাপারটা বল না। বলল গ্রীসলডা।

বলব কিনা ইতস্তত করছি। কেননা, গ্রীসলডা কোন ব্যাপারটাকেই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারে না। সেটা অবশ্য ওর বয়সের দোষ। আমার সঙ্গে ওর কুড়ি বছরের বয়সের ব্যবধান।

সুন্দরীরা সাধারণত চঞ্চলমতি হয়ে থাকে। গ্রীসলডাও সুন্দরী। ওর মানসিক উন্নতির জন্য ধৈর্য ধরে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু চেষ্টা কার্যকরী হয়নি।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার বিয়ে না করাই উচিত ছিল। কেন যে পরিচয় হবার পর ওকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম বুঝতে পারি না।

সব মানুষের জীবনেই বিয়েটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খুব চিন্তাভাবনা করে পরস্পরকে ভালভাবে বুঝে বিয়ে করা উচিত। তা না করার ফলেই এখন মানসিক চাপ সয়ে আমাকে সংসার করতে হচ্ছে।

গ্রীসল ফের সাগ্রহে জানতে চাইল, তোমাদের মধ্যে গোলমালটা কি নিয়ে। বল না শুনি।

বললাম, খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিপত্তিটা ঘটেছে মিস প্রাইস রিডলের পাউণ্ডের তুচ্ছ একটা নোট নিয়ে।

মিস রিডেল হলেন আমাদের মহাসভার একজন সদস্যা। ওঁর বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সময় সংগ্রহ করা অর্থের সঙ্গেই নোটটা রাখা হয়েছিল। পরে সেটা পাওয়া যায়নি। ঘটনা এটুকুই। কিন্তু এ নিয়ে অভিযোগ করেছিল আমাকে।

আমি অবশ্য তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে কোথাও একটু ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়েই ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে ফেলল প্রথেরো।

সেদিনটা ছিল বুধবার। সেদিন সকালে আমি চার্চ ডে স্কুলে পড়াই। অহেতুক মনের ওপর চাপ পড়ায় সারা দিনটাই অস্বস্তিতে কাটাতে হয়েছিল।

সংক্ষেপে ঘটনাটা স্ত্রীকে জানালাম। সে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে জবাব দিল, কর্নেল থেরো নিশ্চয় তামাসা করেছেন।

একটু থেমে ফের বলল, মানুষটার কথা তো জান, মন মেজাজ ভাল থাকে কি করে। আপনজন বলতে কেউ নেই। নতুন বউ আর মেয়ে দুজনেরই চক্ষুশূল। ওভাবে বলে মিস রিডলের একটু মন ভেজাবার চেষ্টা করেছিলেন সম্ভবত।

–তাই বলে ওই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অমন উঠেপড়ে লাগবার কিছু হয়নি। কিছুটা রুক্ষ শোনালো আমার গলা। তার কথার অর্থটা কি দাঁড়াতে পারে তা তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। বোধবুদ্ধিহীন মন্তব্য করে চার্চের হিসেবনিকেশ দেখার প্রসঙ্গ পর্যন্ত তুলে ফেলল।

একটু থেমে পরে বললেন, ওকি মনে করে চার্চের তহবিলের টাকা আমি তছরুপ করে থাকি?

গ্রীসলডা কোমল সুরে বলল, ওরকম সন্দেহ তোমাকে কেউ করবে না। আসলে তুমি সন্দেহের এমন ঊর্ধ্বে যে সেটাই তহবিল তছরুপের একটা সুযোগ হয়ে উঠতে পাবে।

এই সময় মেরী ঘরে ঢুকল। আমি কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

টেবিলে রাইস পুডিং-এর ডিস রেখে মেরী চলে গেলে গ্রীসলডাকে বললাম, কাল সন্ধ্যাবেলা প্রথেরো আসছে। কথা হয়েছে, দুজনে মিলে হিসেব পরীক্ষা করব। আজকের মধ্যেই আমাকে সি.ই.এম-এর জন্য আমার মন্তব্য লিখে রাখতে হবে।

তারপরই আমি প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করলাম, ভাল কথা আজ বিকেলে তুমি কি করছ?

গ্রীসলডা হেসে বলল, নতুন করে আর কি করব। দু-চারজন পাড়াপড়শী হয়তো আসবে। তাদের সঙ্গে চা সহযোগে পরচর্চার আসর বসবে আর কি।

কে কে আসবে তোমার আসরে?

গ্রীসলডা বলল, এই ধরো, মিস প্রাইস রিডলে, মিস ওয়েদারাই, মিস হাটনেল। সেই জাঁহাবাজ মহিলা মিস মারপল তো থাকছেনই।

আমি বললাম, তুমি জাঁহাবাজ বললেও মিস মারপলকে কিন্তু আমার বেশ ভালই লাগে। মহিলা রঙ্গরস বোঝেন, নিজেও রসিকা।

–তা যতই থাক, গ্রামের মধ্যে অমন ধুরন্ধর মহিলা দ্বিতীয় নেই। সব ঘটনাই কেমন করে জেনে যান আর সেই ঘটনা থেকে অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত টেনে বার করেন।

-তোমার চায়ের আসরে আমি কিন্তু থাকছি না। ডেনিস বলল আমার স্ত্রীকে।

–কেন কোথায় যাবে?

–প্রথেরো টেনিস খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে ডেনিস বেরিয়ে গেল। আমি আর গ্রীসলডা পড়ার ঘরে চলে এলাম।

লেখার টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। গ্রীসলডা টেবিলের ওপরে মুখোমুখি বসল। বলল, একটু ভুল হল বোধহয়।

-কি রকম? জানতে চাইলাম।

–আজকের চায়ের আসরে ডঃ স্টোন, মিস ক্রেম আর মিসেস লেসট্রেসকে আসতে বললে ভাল হত। কাল অবশ্য আমি মিসেস লেসট্রেসের বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হয়নি, বাড়ি ছিল না।

টেবিলের ওপরে অকারণে আঙুল ঘষল ও। তারপর বলল, ভাবছি ওকে বলেই আসব। মহিলা কেমন যেন অদ্ভুত।

–কি রকম?

-এই দেখনা এখানে এসে থেকেই গেল। তারপর বাইরেও ক্কচিৎ কখনো বেরয়। সর্বদাই কেমন বিষণ্ণ ভাব।

গ্রীসলডা বকবকানির সুযোগ পেলে থামতে চায় না। তার ওপরে পরচর্চার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। আমি মজা করে বললাম, থেমে গেলে! বলে যাও।

ও হেসে বলল, তুমি এই কথাটাকে হাল্কাভাবে নিলে। তলিয়ে দেখলে না। ওই সুন্দরী মহিলা সত্যি সত্যি আমাদের কাছে রহস্যময়ী হয়ে আছে। তার অতীত ইতিহাস এখানে কেউ জানে না। তার প্রকৃত পরিচয়ও অজানা।

একটু থেমে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, তবে আমার মনে হয় ডাক্তার হেডক ওর সম্পর্কে কিছু জানে।

–কথাটা তো গোয়েন্দার মত হয়ে গেল। ওসব গল্প আজকাল খুব পড়ছ মনে হচ্ছে।

এবারে চোখ বড় বড় করে গ্রীসল আমার দিকে তাকাল। বলল, কি ব্যাপার বলতো। কয়েকদিন আগে সিঁড়িতে দাগ বইটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। নিশ্চয় তুমি সরিয়েছিলে?

হেসে বললাম, পরে তো পেয়েছ। খানিকটা লেখা আমার চোখে পড়েছিল বলে বইটা তুলে রেখেছিলাম।

–আমি জানি লেখাটা কি।

বলতে বলতে আমার প্রতি মোহনীয় কটাক্ষপাত করে ঘর থেকে চলে গেল।

লাঞ্চের পরেই এ ঘরে চলে এসেছিলাম মেনস সোসাইটির চার্চের জন্য একটা বক্তৃতা লিখব বলে। গ্রীসলমবার্ড চলে যেতে এবারে কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলাম।

কিন্তু দুর্দৈব যাকে বলে। ঠিক এই সময় এসে হাজির হল লেটিস। ও হলো কর্নেল প্রথেরোর প্রথম পক্ষের মেয়ে।

আমাকে জিজ্ঞেস করল, ডেনিস কোথায়?

লাঞ্চের পর কোথায় বেরিয়ে গেল। তোমাদের ওখানেই তো টেনিস খেলতে যাবে বলেছিল।

এরপর লেটিস গ্রীসলডার খোঁজ করল।

বললাম, বাগানের স্টুডিওর ঘরে পাবে। লরেন্স ছোকরা ওর ছবি আঁকছে।

লেটিস বলল, বাবার সঙ্গে লরেন্সের সেদিন খুব একচোট হয়ে গেছে।

–সেকি! কেন?

–সাঁতারের পোশাকে ওকে দিয়ে একটা ছবি আঁকাতে চেয়েছিলাম। তাইতেই বাবা যা-নয়-তাই বলে বাড়ি মাথায় করল।

দেখ, ওই পোশাকে বিচে যেতে পারি, তখন কোন দোষ হয় না, ছবি আঁকতে চাইতেই যত দোষ হয়ে গেল।

আমি কি বলব। চুপ করে রইলাম।

লেটিস ফের বলল, বাবা লরেন্সকে সোজা বলে দিল বাড়িতে না আসার জন্য। ওতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। তোমার স্টুডিওতে এসেই আমি ছবি আঁকিয়ে যাব।

-তা তো হয় না লেটিস, আমি বললাম, বিশেষ করে তোমার বাবার যখন আপত্তি রয়েছে।

–তোমরা দেখছি সবাই একই রকম। বড্ড সেকেলে। দিনরাত শাসনে শাসনে থেকে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

যদি হাতে টাকা থাকতো, তাহলে এখান থেকে চলে যেতাম।

একটু থেমে ও আবার বলল, ভাল ব্যবহার তো কোনকালেই করবে না, বাবা যদি মারা না যায় তাহলে এখানে আমি স্বস্তিতে থাকতে পারব না।

–ওভাবে তোমার বলা উচিত হচ্ছে না, লেটিস।

–কেন বলব না, কোনদিন আমার হাতে একটা টাকা দেবে না। কঞ্জুসের হাড়।

লেটিসের গলায় ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছিল। একটু থেমে পড়ে বলল, মা বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে শুনে আমি একটুও অবাক হইনি। তুমি তো জান না, ছেলেবেলা থেকে

আমাকে শোনানো হয়েছে, আমার মা মৃত। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি যে পুরুষকে তার স্ত্রী ছেড়ে চলে যায় সে কি প্রকৃতির পুরুষ।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে লেটিস ফের বলতে লাগল, আমার সম্মা অ্যানা, জেনে রেখো, সে-ও বেশিদিন নেই। খুব শিগগিরই কারো প্রেমে জড়িয়ে পড়বে।

জানো, অ্যানা আমাকে ঘৃণা করে। অথচ ভাল ব্যবহার দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

ওর কথার তোড় যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে, আমি শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। আমার লেখাটা বরবাদ হয়। ভাগ্য ভাল, লেটিস নিজেই সেই আশঙ্কা দূর করল।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল, আমার গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো তোমার চোখে পড়েছে?

-কেন কি হল সেগুলো?

–আমিই রেখেছি, কিন্তু কোথায় যে তা আর খুঁজে পাচ্ছি না। দিন দিন অন্যমনস্কতা কেমন বেড়ে যাচ্ছে। বড্ড বিশ্রী লাগছে। নাঃ এখন উঠি। তিনটের সময় আবার ডঃ স্টোনের গাড়ি দেখতে যাবার কথা।

আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। চারটে বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। হাসতে হাসতে ওকে সময়টা জানালাম।

–সর্বনাশ, বুঝতেই পারিনি। ওরা কি আর এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। তবু একবার ঘুরে আসি গে।

ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, তুমি ডেনিসকে বলে দিও।

কি বলতে হবে বুঝতে পারলাম না। তবু ঘাড় নেড়ে সায় জানালাম।

ডঃ স্টোনকে আমি জানি। তিনি একজন সুপরিচিত প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের ব্লু বারে থাকবার জন্য কিছুদিন হল এসেছেন। কর্নেল প্রথেরোর জমিতে লোকজন নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছেন।

ইতিমধ্যেই লেটিসকে তার কাজ দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে বারকয়েক ডঃ স্টোনের বিসংবাদ হয়ে গেছে। খবরটা শুনে অবশ্য আমার বেশ মজাই লেগেছিল।

ডঃ স্টোনের সেক্রেটারী মিস ক্রেমের সঙ্গে শুনেছি লেটিসের ভাব জমেছে। মহিলার বয়স পঁচিশ ছুঁয়েছে। বেশ স্বাস্থ্যবতী আর আমুদে ধরনের।

লেটিস যেরকম বাঁচাল আর চঞ্চল কি করে সেই মহিলার সঙ্গে তার পটলো বুঝতে পারি না। তাছাড়া তার সম্পর্কে গ্রামের মানুষের বিভিন্ন ধারণা। লেটিসেরও সে সব না জানার কথা নয়।

লেটিসের কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বছর পাঁচেক হল কর্নেল প্রথেরো ফের বিয়ে করেছিল। দ্বিতীয় বউ সুন্দরী। মেয়ে আর সম্মায়ের মধ্যে যে সম্পর্ক সুখের নয় তা আমি আঁচ করতে পারতাম।

নাঃ বক্তৃতাটা লিখতে গিয়ে বড় বাধা পড়ছে। লেটিস যেতে না যেতেই সে এসে হাজির হল। প্রথেরোর সঙ্গে কালকের হিসেবনিকেশে বসার কথাটা জানতে চাইল।

দু-চার কথাটা সংক্ষেপে বলে ওকে বিদেয় করলাম। তারপর চটপট লেখাটা শেষ করলাম। সাড়ে চারটে নাগাদ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে এলাম।, দেখলাম গ্রীসলডার চায়ের আসরের তোড়জোড় চলছে। ইতিমধ্যেই চারজন অতিথি এসে। হাজির হয়েছে।

গ্রীসলডা চায়ের টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসে তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

উপস্থিত সকলের সঙ্গেই আমি সম্ভাষণ বিনিময় করলাম। তারপর মিস মারপল আর মিস ওয়েদারবাই-এর মাঝখানের চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

গ্রীসলডা কৌতুকহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছ, ডঃ স্টোন আর মিস ক্রেম-এর কথা?

–কি হল ওদের? জানতে চাইলাম আমি।

জবাব দিলেন মিস ওয়েদারবাই। গ্রীসলডার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর মত সুন্দরী মহিলার একজন অবিবাহিত পুরুষের সেক্রেটারীর কাজ নেওয়াটা কিছুতেই ঠিক হয়নি।

আমি বললাম, তা কেন, মেয়েরা আজকাল ছেলেদের মতই কাজ করতে পারে।

এর পর অনিবার্যভাবেই আধুনিকতার হালচাল নিয়ে একটা ছোটখাট আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

একসময় আমার স্ত্রী বলল, আসলে একটা অভিনব কিছু করার ইচ্ছেতেই মিস ক্রেম ডঃ স্টোনের সেক্রেটারীর কাজটা নিয়েছে।

আমাদের দুজনের কথাই দেখলাম অন্য চার মহিলার মনঃপুত হল না।

সব শেষে মিস মারপল আমার স্ত্রীর পিঠে আলতো করে চাপড় দিয়ে বলল, তুমি ভাই বড় সরল। অবশ্য কমবয়সী মেয়েদের মন এমনিই সরল হয়।

গ্রীসলডা সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, সরলতার প্রশ্ন নয়, ব্যাপারটা বাস্তবতার। তুমি কি সত্যি সত্যি ভাবছো, ওরকম টেকো মাথার বেরসিক লোককে মিস ক্রেম বিয়ে করে বসবে?

মিস মারপল বলল, লোকটা কেবল বেরসিক নয়, বদমেজাজীও। কদিন আগেই তো কর্নেলের সঙ্গে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল।

মিস ওয়েদারবাই বলল, ওই ছোকরা শিল্পী রেডিং-এর কথা শুনেছো তো; কি একটা গোলমালে কর্নেল নাকি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে?

মিস মারপল মাথা নেড়ে মিস ওয়েদারবাইকে সমর্থন করল। বলল, লোকটা লেটিসের স্নানের পোশাকে ছবি আঁকতে গেছিল।

–আমার মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে লটঘট কিছু আছে। মিস প্রাইম রিডলে বলল, ওই শিল্পী ছোকরা ওই বাড়িতে ঘুরঘুর করে।

একটু থেমে ফের বলল, মেয়েটারই বা কি দোষ, জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ পায়নি, বাপ তো ওই রকম গোঁয়ার গোবিন্দ। সম্মা আর কতটা হবে সেতো বুঝতেই পারছ। ছোকরার সঙ্গে না ঘেঁষে আর কি করে।

মিস ওয়েদারবাই বলল, তবে যাই বল শিল্পী ছোকরাকে দেখতে কিন্তু চমৎকার।

মিস হার্টনেল বলল, শিল্পীটিল্পীরা বরাবরই নারীঘেঁষা হয়। ওদের স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়। না।

প্রাইস রিডলে বলল, তা না হলে কি আর স্নানের পোশাকে ছবি আঁকতে চায়।

–আমাকেও তো সে এঁকেছে। আমার স্ত্রী বলল।

মিস মারপল তার দিকে কটাক্ষ করে বললে, এঁকেছে, তবে নিশ্চয় স্নানের পোশাকে নয়।

গ্রীসলডার ভাষায় এই হল তাদের পরচর্চার আসর। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল।

বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। উঠব উঠব মনে করছি। বলতে একদম ভুলে গেছি। ডাক্তার হেডককে মিস লেসট্রেঞ্জের ঘর থেকে বেরুতে দেখলাম।

কথাটা শুনে ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল।

মিস প্রাইস রিডলে বলল, তাহলে অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে।

-তাহলে হঠাৎ করেই কিছু হয়েছে। আমি তো আজ বিকেল তিনটে নাগাদও ওকে বাগানে বেড়াতে দেখেছি। কই দেখে তো অসুস্থ বলে মনে হয়নি।

ডাক্তার আর লেসট্রেঞ্জ মনে হয় পূর্বপরিচিত। বলল মিস প্রাইস রিডলে।

–ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। মিস ওয়েদারবাই ফোড়ন কাটল।

গ্রীসলডা সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে বলল, আমি জানতে পেরেছি একজন মিশনারীর খপ্পরে ও পড়েছিল। কোন কিছুই আর বাকি রাখেনি–বউ করতে চেয়েছিল। শেষে ডাক্তার নাকি ওকে উদ্ধার করে।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের আলোচনা বেশ সরস হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পরচর্চার আসর একসময় ঝিমিয়ে এলো। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মিস ওয়েদারবাই বলল, তবে যাই বল ভাই, লরেন্স রেডিং-এর সঙ্গে লেটিস থেরোর সম্পর্ক অনেকদূর অবধি গড়িয়েছে। তুমি কি বল মারপল? গ্রামের কিছুই তো তোমার অজানা থাকে না।

মিস মারপল একমুহূর্ত কি ভাবল। পরে ধীরে ধীরে বলল, আমার ধারণা লেটিস নয়, যদি ওই ছোকরার সম্পর্ক হয়েই থাকে তবে সে সম্পূর্ণ অন্য কেউ।

.

০২.

খানিক পরেই আমি চর্চা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে নামতেই মিস লেসট্রেঞ্জের সঙ্গে দেখা হল। দুজনে গল্প করতে করতে চলতে লাগলাম।

বাড়ির কাছে পৌঁছলে ও অনুরোধ জানাল তার বাড়ি যেতে। আমি আপত্তি করলাম না। দুজনে বাড়ির ভেতরে গেলাম।

কিছুদিন আগে লেসট্রেঞ্জ এই সেন্ট মেরী মিড-এ এসেছে। এখন দেখছি পাকাপাকি ভাবেই রয়ে গেছে।

বুঝতে পারি না ওর মত একজন সুন্দরী আধুনিকা এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে কেন। ওর পক্ষে এই পরিবেশ নির্বাসন ছাড়া কিছুই নয়।

বসার ঘরে পরিষ্কার আলোয় এই প্রথম ওকে সামনাসামনি এত স্পষ্ট করে দেখার সুযোগ পেলাম। ওকে কেবল সুন্দরী বললে কমই বলা হয়। দীর্ঘাঙ্গী, স্বর্ণকেশী। চোখের পাতা ভ্রূ গভীর কালো ডাগর আয়ত নীল চোখ দুটোকে মায়াময় করে রেখেছে। মুখের ডৌলটিও এককথায় নিখুঁত।

নির্দিষ্টভাবে কথাবলার প্রসঙ্গ কিছুই ছিল না। বই, ছবি, পুরনো দিনের চার্চের কথা–এসব নিয়েই খানিকক্ষণ টুকরো টুকরো গল্প হল। এর মধ্যেই আমার কেন যেন মনে হল, ও আমাকে কিছু বলতে চায়।

কিন্তু কিছুই বলল না। আমি একসময়ে উঠে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে আমি একপলক তাকালাম ওর চোখের দিকে। একমুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, আপনার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব।

ও যেন আমার এই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। বলল, আপনার অনেক দয়া। কিন্তু এমন এক জটিল ব্যাপারে জড়িয়ে আছি, মনে হয় না আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারে। তবু আপনি যে সাহায্য করতে চেয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

বুঝতে অসুবিধে হল না, ও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে নিজের সম্পর্কে এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে। আমাকে তার আর কিছু বলার নেই।

মিস লেসট্রেঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি মিস হার্টনেল এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। বলল, দেখলাম লেসট্রেঞ্জের বাড়ি থেকে বেরুলেন। কিছু জানতে পারলেন?

-কি ব্যাপারে? বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম।

–ওই রহস্যময়ী লেসট্রেঞ্জ সম্পর্কে? ও কি সত্যিই বিধবা, নাকি স্বামী বাইরে কোথাও থাকে?

মহিলার কৌতূহল অশোভন ঠেকলেও বিস্মিত হলাম না। গ্রামের এসব মহিলার অপরের সম্পর্কে মাত্রাছাড়া কৌতূহল সম্পর্কে আমি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল।

বললাম, এসম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। এসব কোন কথা উনি আমাকে বলেননি।

ডাক্তার হেডকের সঙ্গে ওর কি অনেক দিনের পরিচয়?

–মাপ করবেন, বলতে পারব না।

মিস হার্টনেল একমুহূর্ত কি ভাবল। কিছু গোপন করছি কিনা সম্ভবত তা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল।

আমি তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ না দিয়ে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম।

.

গেট খুলে ভিকারেজে ঢুকতে গিয়ে মনে হল লরেন্স রেডিং-এর স্টুডিওটা একবার ঘুরে যাওয়া যাক। গ্রীসলডার ছবি কতটা এগিয়েছে জানা যাবে।

স্টুডিওতে বাইরের কোন লোক থাকতে পারে আমার ধারণা ছিল না। তাছাড়া কথাবার্তার শব্দও কিছু পাইনি। আর ঘাসের ওপর দিয়ে আমার চলাচলও ছিল নিঃশব্দ।

কবাট ঠেলে ভেতরে তাকাতেই অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হল। দুজন নারীপুরুষ পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে চুম্বনরত।

পলকের দেখাতেও চিনতে ভুল হল না। একজন ছোকরা শিল্পী লরেন্স। অপরজন কর্নেল প্রথেরোর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সাড়াশব্দ না করে নিঃশব্দে পা ফেলে নিজের পড়ার ঘরে ফিরে এলাম।

একটা অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থা। এমন একটা অবৈধ সম্পর্ক আবিষ্কার আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল।

ব্যাপারটা আমার কাছে আঘাত হিসেবেই এল। কেন না আজ বিকেলেই লেটিস এসে কিছুক্ষণ বকবক করে গেছে।

যেরকম ঘনিষ্ঠতা ওদের দেখা গেল তাতে বুঝতে পারছি ভদ্রমহিলার সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটা বোঝাঁপড়া গড়ে উঠেছে। সত্যায়ের সঙ্গে লরেন্সের এই সম্পর্কের কথা লেটিস নিশ্চয়ই জানে না।

মিসেস প্রথেরো এমন একটা অবৈধ প্রণয়ের সঙ্গে জড়িত; চোখে দেখেছি বলেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে না। নানান রকম চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করতে লাগল।

মিসেস প্রথেরো আচমকা ঘরে ঢুকলেন। তাকে দেখে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। হাসবার চেষ্টা করে সোফায় বসতে বললাম।

তাকালাম মুখের দিকে। চোখ নামিয়ে নিল। মুখ ফ্যাকাশে। ঠোঁট শুকনো। এ যেন খানিক আগে দেখা মিসেস প্রথেরো নয়।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে রইল। মনে হল মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করল। তারপর মুখ তুলে বলল, সরাসরি আপনার কাছে চলে আসাটাই ভাল মনে হল। আপনি আমাদের দেখে ফেলেছেন...

আমি নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বলতে লাগল, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। বলে পাথরের মূর্তির মতই বসে রইল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমার কাছ থেকে কোন ভৎর্সনা আশা করছেন?

-না, তা নয় মিঃ ভিকার।

–আপনি একজন বিবাহিত মহিলা।

–আমি তা ভালরকমেই জানি। তবে আমি উচ্ছৃঙ্খল নই, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়।

–তা যদি না হয়, আমি আনন্দিত হব।

–বিশ্বাস করুন মিঃ ভিকার, অসুখী মানুষের যন্ত্রণা বড় ভয়ানক। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। মুক্তির একটা পথ হাতড়ে মরছিলাম।

বলতে বলতে মিসেস প্রথেরো থামল। তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখের পাতা ঘন হয়ে উঠছে।

সহসা যেন সজাগ সচকিত হয়ে উঠল, এভাবে বলে উঠল আমার জীবনের যন্ত্রণার ইতিহাস কেউ জানে না।

বিয়ের প্রথম দিন থেকেই লোকটার সঙ্গ আমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। কোন মেয়েই এমন লোকের সঙ্গে থেকে সুখী হতে পারে না।

আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আমার ভেতরের অস্থিরতা। আমি মনে প্রাণে চাইছি লোকটা মরে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিক। ভালমন্দের কথা জানি না, তবু আমি তাই চাইছি...আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি।

কথা বলতে বলতে মিসেস প্রথেরো দরজার দিকে ঘাড় ফেরালেন। বললেন, মনে হল কারো পায়ের শব্দ...সম্ভবত লরেন্স...

মৃদু একটা শব্দ আমার কানেও পৌঁছেছিল। আমি উঠে ঘরের বাইরে গেলাম। নিচে বাগানের দিকে তাকালাম। কিন্তু কাউকে কোথাও চোখে পড়ল না।

ঘরে ফিরে এলাম। মিসেস প্রথেরো নিচু হয়ে কপালে হাত দিয়ে বসেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি না কি করব। আমাকে বলে দিন...

একজন পাদরীর কর্তব্য হিসেবে আমি ওর পাশে বসে এই অবস্থায় যা বলা উচিত তাই বললাম। ঝোঁকের মাথায় মানুষ অনেকসময় নিজেরই চরম ক্ষতি করে ফেলে। তখন বুঝতে পারে না কিন্তু সারাজীবন তার খেসারত দেয়। ওকে নিষেধ করলাম যেন এমন কিছু করে না ফেলে।

আমার কথা কতদূর বুঝতে পারল বা মানল বোঝা গেল না। একসময় ও উঠে দাঁড়াল। আমাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর চলে গেল। আমি তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই মহিলাটিকে এতদিন আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। তার চরিত্রের ভুল ব্যাখ্যা করেছি। আজ জীবন থেকে বঞ্চিত যন্ত্রণাকাতর এবং মরিয়া একটি মানুষকে দেখতে পেলাম।

লরেন্সকে ও পাগলের মত ভালবেসেছে। অথচ লরেন্স কিন্তু তার চাইতে বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট।

.

০৩.

একদম ভুলে গিয়েছিলাম যে লরেন্স রেডিং সেই রাত্রেই আমাদের এখানে নৈশভোজে আমন্ত্রিত। অনুমান হল সে আসবে না। পরে হয়তো কোন একটা অজুহাত দেবে।

কিন্তু না, লরেন্স এলো এবং আমরা চারজনে একসময় খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

এইবেলা তার দিকে একটু অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকালাম। রীতিমত আকর্ষণীয় পুরুষ। বয়স আন্দাজ তিরিশ ছুঁয়েছে। চকচকে নীল চোখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। সর্বদা হাস্যময়।

আমার ধারণা ওর শরীরে আইরিশ রক্ত প্রবহমান।

লক্ষ্য করছিলাম, কথাবার্তা বলতে বলতে লরেন্স মাঝে মাজেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

ডিনারের পর লরেন্স পড়ার ঘরে আমার কাছে এসে বসল। আমাকে সরাসরি বলল, আমাদের ব্যাপার তো আপনার কাছে আর লুকনো নেই। এখন এ ব্যাপারে আপনি কি করতে চাইছেন?

লরেন্স পুরুষমানুষ। কোনরকম দ্বিধা না করে আমার বক্তব্য পরিষ্কার ভাবেই জানালাম।

সবশেষে বললাম, গ্রামের মানুষজন চুপ করে থাকবে না, তাদের চোখ কান যেমন সজাগ তেমনি মুখেরও আগল নেই। ওদের দুজনেরই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

লরেন্স সবকথাই চুপ করে শুনল। আমার সবকথাই যে ঠিক তা সে স্বীকার করল।

পরে বলল, এটা যদি একটা নাটক হত, তাহলে ওই বুড়োটা নির্ঘাৎ মারা পড়ত। আর সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

বললাম, এসব কথা তোমার ভাবা বা বলা উচিত নয়।

লরেন্স বলল, আমি একথা বলতে চাইছি না যে বুড়োটাকে আমি খুন করব। তবে যদি কেউ এই কাজটা করে আমি অবাক হব না। কেননা, ওই বুড়োকে কোন মানুষই সহ্য করতে পারে না।

একটু থেমে পরে আবার বলল, বুড়োর দ্বিতীয় বউ তাকে একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু মহিলা এমনই চাপা স্বভাবের যে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

আপনি অনুমান করতে পারবেন না অ্যানা কিরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। যে কোন সময় ও যা খুশি করে বসতে পারে।

একমুহূর্ত থেমে কি চিন্তা করল। পরে বলল, আমার যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে ওকে নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যেতাম।

লরেন্সের কথায় আসন্ন একটা ঝড়ের আভাস পাওয়া গেল। শান্তভাবে বললাম, লরেন্স, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তোমার সেন্ট মেরী মিড ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তা না হলে মিসেস প্রথেরো বড় বেশি অস্থির হয়ে পড়বে।

ব্যাপারটা একদিন মিঃ প্রথেরোর চোখেও ধরা পড়ে যাবে। লোকের কানাঘুষাও কানে যাবে। তখন একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটবে।

এরপর আর বেশি কথা হল না। আমার কথা ভেবে দেখবে, এ কথা জানিয়ে লরেন্স বিদায় নিল।

.

পরদিন প্রাতরাশের পরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিছু রুগীকে দেখে ওষুধ দেবার ব্যাপার ছিল। গ্রীসলডা ট্রেনে করে লণ্ডন চলে গেল।

ভিকারেজে ফিরে এলাম বেলা সোয়া চারটে নাগাদ। ঢুকতেই মেরী জানাল, মিঃ লরেন্স আমার জন্য পড়ার ঘরে অপেক্ষা করছে।

পড়ার ঘরে এসে দেখলাম সে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। মুখ শুকনো।

পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে কয়েকটা কথা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছি। সারারাত চোখে ঘুম ছিল না।

আপনার কথা ভেবে দেখলাম আপনি ঠিকই বলেছেন।

বলতে বলতে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পরে বলল, আমি স্থির করেছি, অ্যানার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে আমি এখান থেকে চলে যাব।

-খুব ভাল কথা। আমি যা বুঝতে পারছি, তুমি এখানে থাকলেই ওর বিপত্তি বাড়বে।

-হ্যাঁ। আমি নিজেও বুঝতে পারছি। আপনাকে কেবল একটা অনুরোধ করব, অ্যানাকে দেখবেন।

আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লরেন্স বলল, আজ রাতেই সব গোছগাছ করে রাখব আমি যাতে কাল সকালেই এখান থেকে চলে যেতে পারি। অ্যানার সঙ্গেও দেখা করব আজ সন্ধ্যাবেলা। আঁকার কাজের জন্য আপনি এখানে আমাকে একটা ঘর দিয়েছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ। কেবল মিস ক্লেমেন্ট-এর ছবিটা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি।

–সে আর কি করা। ও নিয়ে ভেবো না। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

লরেন্স রেডিং ঘরথেকে বেরিয়ে গেল।

.

০৪.

ভিকারেজে ফিরতে প্রায় সাড়ে ছটা বেজে গেল। দরজা খুলে ঢুকতে যাব এমন সময় লরেন্স ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে হল। উদ্ভ্রান্ত মানুষের চেহারা পুরোপুরি। ভেতরে যেন তোলপাড় চলছে। কেমন যেন কাঁপছে।

বললাম, তুমি এসেছিলে? একটা কাজে একটু প্রথেরার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

-প্রথেরার সঙ্গে! আমার কথা কেড়ে নিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল লরেন্স।

পরে বলল, আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা করুন।

কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা। কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, তা চলে যাচ্ছ কেন, এসো

-না-না। আমাকে চলে যেতে হবে অবশ্যই।

আমাকে বিস্মিত করে একরকম ছুটেই যেন লরেন্স বেরিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম পেছন থেকে।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই মেরীর সঙ্গে দেখা হল। জানাল কর্নেল প্রথেরো পড়ার ঘরে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কখন এসেছেন?

-সোয়া ছটা নাগাদ।

বুঝতে পারলাম, এজন্যই তার বাড়ি গিয়ে দেখা পাইনি।

মেরীকে জিজ্ঞেস করলাম, লরেন্স রেডিং এসেছিল?

–কিছুক্ষণ আগেই এসেছিলেন। বসতে বলেছিলাম। কর্নেল যে পড়ার ঘরে আছেন সেকথাও বলেছিলাম। মনে হয় ওই ঘরেই অপেক্ষা করছেন।

-না চলে গেছে। গেটের মুখে দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে।

হতে পারে। আমি দেখিনি কখন চলে গেছেন। এদিকে মিসেস ভিকারও তো ফিরলেন না এখনো।

মেরী রান্নাঘরে চলে গেল। আমি পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

দরজাটা বন্ধ ছিল। খুললাম। ভেতরে পা দিয়ে থমকে গেলাম। যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম মুহূর্তের জন্য।

কর্নেল প্রথেরো আমার লেখার টেবিলে অস্বাভাবিক ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথা থেকে ঘাড় বেয়ে রক্ত গড়িয়ে টেবিলে জমছে, মেঝেতে পড়ছে।

শরীরটাকে টেনে টেবিলের কাছে নিয়ে এলাম। নাড়ী দেখার জন্য একটা হাত তুলে নিয়েই চমকে উঠলাম।

বরফের মত ঠাণ্ডা। মানুষটা আর বেঁচে নেই। মাথায় গুলি করে মারা হয়েছে।

কেমন একটা ঘোরের মত লাগছিল। দরজার কাছে গিয়ে মেরীকে ডাকলাম।

ডাক শুনে মেরী ছুটে এলো। ডাক্তার হেডক সামনের মোড়ের মাথাতেই থাকেন। বললাম, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, এখুনি গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার হেডক এসে পৌঁছলেন। তাকে কর্নেলের কাছে নিয়ে গেলাম।

ডাক্তারও থমকালেন। পরমুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ঝুঁকে একবার দেখলেন। পরীক্ষা করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম। ডাক্তার বললেন, আমার ধারণা প্রায় আধঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

–এটা কি আত্মহত্যা?

–অসম্ভব। আঘাতটা মাথার পেছন দিকে। তাছাড়া আত্মহত্যার অস্ত্র তো কোথাও নেই।

ঘরে খুঁজে দেখা হল। কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না।

ডাক্তার হেডক পুনরায় বললেন, এখন কিছুতে হাত না দেওয়াই ভাল।

বলতে বলতে তিনি টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন। থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানালেন। পরে আমার পাশে এসে বসলেন।

–খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। মৃতদেহ আপনার চোখে পড়ল কখন?

আমার তখনই ঘটনাটা মনে পড়ল। বললাম, একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। বিকেল নাগাদ এক মহিলা ফোনে জানালেন তাঁর স্বামী খুবই অসুস্থ। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেলাম। কিন্তু মজার ব্যাপর হল, দেখলাম মহিলার স্বামী দিব্যি সুস্থ। ফোনের কথা জানাতে মহিলা অবাক হয়ে গেলেন। তারা কেউই ফোন করেননি।

কথা শুনে ডাক্তার হেডকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। বললেন, খুবই পরিকল্পিত ব্যাপার মনে হচ্ছে। আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্যই ফোন করা হয়েছিল। ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কোথায়?

–তিনি লণ্ডনে গেছেন।

কাজের মেয়েটি?

–রান্নাঘরে।

রান্নাঘরটা কতদূরে?

–এই ঘরেরই উল্টো দিকে।

–কর্নেল প্রথেরো যে আজ বিকেলে এখানে আসবেন নিশ্চয় কেউ কেউ জানতো?

–হ্যাঁ, গ্রামের অনেকের সামনেই তো বলেছিল আসার কথাটা।

একটু থেমে ডাক্তার কি ভাবলেন। পরে বললেন, কর্নেলের ওপর ব্যক্তিগত রাগ বা আক্রোশ থাকতে পারে এমন কারোর কথা মনে পড়ে?

আমার মনে পড়ল সবার আগেই লরেন্স রেডিং-এর কথা। ওর উদভ্রান্ত চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় করিডরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

ডাক্তার হেডক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, নিশ্চয় পুলিস আসছে।

বলতে বলতেই পুলিস কনস্টেবল হার্স্ট ঘরে ঢুকলেন।

শুভসন্ধ্যা জানিয়ে তিনি বললেন, যে কোন মুহূর্তে ইনসপেক্টর এসে যাবেন, ইতিমধ্যে তিনি নির্দেশিত কাজগুলো সমাধা করে রাখতে চান।

হার্স্ট মৃতদেহের দিকে তাকালেন। বললেন, আমার বিশ্বাস কর্নেল প্রথেরোকে গুলিবিদ্ধ অবস্থাতে ভিকারেজের পড়ার ঘরে পাওয়া গেছে।

বলতে বলতে তিনি লেখার টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ঘরের কোন কিছুতে যেন হাত দেওয়া না হয়।

পকেট থেকে পেন্সিল নোটবুক বার করে এবারে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন হার্স্ট। আমি তাকে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বললাম।

ধৈর্য ধরে তিনি আমার কথা শুনলেন। পরে ডাঃ হেডকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডাঃ হেডক, আপনার মতে মৃত্যুর কারণটা কি?

-খুব কাছে থেকে মাথায় গুলি করে মারা হয়েছে।

–অস্ত্রটা?

বুলেটটা শরীর থেকে বার না করা পর্যন্ত সেটা বলা যাচ্ছে না।

–কোন সম্ভাবনা

–হ্যাঁ, বাহ্যিক ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে বুলেটটা কোন ছোট ক্যালিবারের পিস্তল থেকেই ছোঁড়া হয়েছে। সম্ভবত মসার পিস্তল ২৫।

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আগের দিন রাতেই লরেন্স রেডিং কথায় কথায় জানিয়েছিল তার কাছে একটা মসার পিস্তল রয়েছে।

কনস্টেবল হার্স্ট পুনরায় ডাঃ হেডককে জিজ্ঞেস করলেন, কখন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলে আপনার ধারণা?

ডাঃ হেডক একটু ইতস্তত করলেন, পরে জানালেন, কর্নেল ঠিক আধঘণ্টা আগে মারা গেছেন। আমার মতে সময়টা ওই রকমই।

হার্স্ট এবার আমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির কাজের মেয়েটা কি কিছু শুনতে পেয়েছিল?

–আমার মনে হয়, কিছু শুনতে পায়নি। তবে ওকে জিজ্ঞেস করলেই ব্যাপারটা সঠিক জানা যাবে।

সেই সময়েই ইনসপেক্টর স্লাক এসে পৌঁছলেন। ছোট ছোট কিছু প্রশ্নে প্রাথমিক সব কিছু জেনে নিয়ে তিনি পড়ার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঝুঁকে খুঁটিয়ে দেখলেন। পরে উৎফুল্ল ভাবে বললেন, হ্যাঁ, এটাই আমরা জানতে চেয়েছিলাম। গুলির আঘাতে লোকটা যখন কাত হয়ে পড়ে তখন ধাক্কা লেগে ঘড়িটা উল্টে পড়ে। খুনের সমগ্রর আঘাতে লোকটা যখন ভাবে বললেন, হয়

তারপর ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে পরে বললেন, ছটা বেজে বাইশ মিনিট। আচ্ছা ডাঃ হেডক, আপনি মৃত্যুর সময়টা কখন বলেছিলেন?

হেডক জবাব দিলেন, আধঘণ্টা আগে। তবে..

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইনসপেক্টর স্লাক বললেন, এখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। আমি খবরটা পেয়েছি দশ মিনিট আগে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মৃতদেহটা আবিষ্কার হয়েছিল পৌনে সাতটা নাগাদ। ঠিক আছে, ওতেই যথেষ্ট হবে।

আমার ওই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলবার চেষ্টা করলে বাধা দিয়ে স্লাক বলল, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। সময় বড় কম।

–কিন্তু ওই ঘড়িটা

স্লাক আমার কথায় কান না দিয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, লোকটা ওখানে কি কিছু লিখবার জন্যে বসেছিল? আরে ওটা কি?

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে ছোট একটা চিরকূট টেবিল থেকে কুড়িয়ে নিলেন। উৎসাহে তার চোখ চকচক করে উঠল।

আমরা পাশে গিয়ে চিরকূটটার ওপরে চোখ ফেললাম। ছোট্ট একটুকরো কাগজ। মাথার দিকে লেখা ছটা কুড়ি। তার নিচে ডিয়ার ক্লেমেন্ট বলে লেখাটা শুরু হয়েছে।

মাত্র কয়েকটি শব্দ–দুঃখিত, আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমি নিশ্চয়...

এর পরেই ছেদ পড়েছে। মিঃ প্রথেরো আর কোন শব্দ লিখে উঠবার সুযোগ পাননি।

কিছুক্ষণ পরেই মেরী এসে জানিয়ে গেল মিনিট পাঁচেক আগে গ্রীসলডা ফিরে এসেছে।

আমি গিয়ে বসার ঘরেই তাকে পেলাম। দেখে মনে হল কেমন ভীত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ওকে ঘটনাটা খুলে জানালাম। সবশেষে বললাম চিরকূটের মাথায় লেখা রয়েছে ছটা কুড়ি! আর ঘড়িটা উল্টে গিয়ে ছটা বাইশ মিনিটে বন্ধ হয়ে ছিল।

গ্রীসলডা বলল, তুমি বললে না কেন ঘড়িটা প্রায় সব সময়ই পনেরো মিনিট ফাস্ট হয়ে থাকে?

বললাম, বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ইনসপেক্টর আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

হতভম্ব হয়ে গ্রীসলডা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পরে বলল, এতে যে সব ব্যাপারটাই গুলিয়ে যাবে।

ঘড়িতে যখন ছয়টা কুড়ি, তখন প্রকৃত সময় হবে ছটা বেজে পাঁচ মিনিট। আমার ধারণা, ওই সময়ে প্রথেরো এখানে পৌঁছয়নি।

.

০৫.

মেরী এসে খবর দিল ইনসপেক্টর স্লাক চলে গেছেন। যাবার সময় পড়ার ঘরে তালা দিয়ে বলে গেছেন ওই ঘরে কেউ যেন ঢুকবার চেষ্টা না করে।

ইনসপেক্টর আমার সঙ্গে একবার কথা না বলে চলে যাওয়ায় বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

গ্রীসলডা ওল্ড হলে যেতে চাইল। মিসেস প্রথেরোকে একবার এই সময়ে দেখে আসা দরকার। আমি আপত্তি করলাম না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে এল।

ক্লান্ত শরীরে সোফায় বসে পড়ে বলল, আমি পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগেই মিঃ স্লাক বেচারী অ্যানকে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে।

-খুবই দুঃখজনক। খবরটা তিনি কিভাবে নিয়েছেন?

–ভালো। দেখে খুবই শান্ত মনে হল।

-ওটাই স্বাভাবিক। মিসেস প্রথেরো শোকে পাথর হয়ে যাবেন, এমনিটা আমি আশা করতে পারি না।

–লেটিস কি করছে?

–টেনিস খেলতে গেছে, এখনো ফেরেনি।

–লেটিসও যে খবরটা পেয়ে খুব কাতর হবে মনে হয় না। বাবাকে ও একেবারেই পছন্দ করত না।

–তাহলেও, আঘাত তো বটে। মৃত্যু অনেক সময় মানুষের অনুভূতিগুলিকে পাল্টে দেয়।

.

পরদিন সকালে আমরা সবে প্রাতরাশ টেবিলে বসেছি। মেরী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানাল রুটিওয়ালার কাছে খবর পেয়েছে, পুলিস নাকি লরেন্স রেডিংকে গ্রেপ্তার করেছে।

–অসম্ভব। এ হতে পারে না, গ্রীসলডা বলে উঠল, পুলিস নির্ঘাৎ ভুল করেছে।

মেরী বলল, গতরাত্রেই নাকি রেডিং পুলিসের কাছে গিয়ে পিস্তল সমেত আত্মসমর্পণ করেছে। পুলিসের কাছে স্বীকার করেছে নিজেই খুনটা করেছে।

গ্রীসলডা বলল, ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই আমার মনে হচ্ছে। ওটা নির্ঘাৎ একটা দুর্ঘটনা হবে। কিসের স্বার্থে লরেন্স কর্নেল প্রথেরোকে খুন করবে? খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে।

আমার মাথায় অনেক ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বললাম, কিছুদিন আগে তো ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। তারই...

-হ্যাঁ, লেটিসের ছবি আঁকা নিয়ে। তাছাড়া গোপনে লেটিসের সঙ্গে তার প্রেমও যদি থাকে তার জন্য লরেন্স কর্নেলকে খুন করতে যাবে কেন?

আমি চিন্তান্বিত ভাবে বললাম, আসল ব্যাপারটা কি তা তো আমরা কেউই জানি না।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, তোমাকে তো বলেছি, গেটের বাইরে লরেন্সের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন তাকে কেমন উন্মাদের মত লাগছিল। ও কাঁপছিল রীতিমত।

–তা হতে পারে। কিন্তু খুন অসম্ভব। আমি মেনে নিতে পারি না।

–কিন্তু, ঘড়িটাও তো খুনের সাক্ষীই দিচ্ছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যই লরেন্স ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল।

-তুমি ভুল করছ গ্রীসলডা বলল, আমাদের ঘড়িটা যে ফার্স্ট যায় তা লরেন্স জানতো। বোকার মত ঘড়ির কাঁটা ও ছটা বাইশে ঘোরাতে যাবে কেন? দিতে হলে পৌনে সাতটার দিকে এগিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

–এমন হতে পারে যে সে জানতো না প্রথেরো কখন এখানে এসেছে। অথবা ওই সঙ্গীন মুহূর্তে ঘড়ি যে ফাস্ট যায় সে কথা একদম ভুলে গিয়েছিল।

–সে হয় না কেউ যখন খুন করতে যায়, এসব বিষয়ে সে খুবই সতর্ক থাকে।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মিস মারপল এসে ঘরে ঢুকল। বলল, তখন থেকে ঠিক করেছি, ইনসপেক্টর স্লাকের সঙ্গে বুঝে শুনে চলব। উদ্ভট লোক।

কাল রাতে খবর দিয়েছিল আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সকালে ফোন করে জানালো তার দরকার নেই।

আমি বললাম, আসামী! গ্রেপ্তার হয়ে গেছে, তাই হয়তো দরকার হয়নি।

গ্রেপ্তার! আসামী, কে? উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে উঠল মিস মারপলের।

বুঝতে পারলাম খবরটা তখনো পায়নি। তাই বললাম, একজন গ্রেপ্তার হয়েছে–লরেন্স রেডিং।

–সে কী! অসম্ভব। আমি ভাবতে পারছি না।

–আমিও খবরটা বিশ্বাস করি না। বলল গ্রীসলডা তবে সে নাকি নিজে স্বীকার করেছে।

–স্বীকার করেছে? মিস মারপল বলল, আমি দেখছি উল্টো দিকে চেয়ে আছি। তাহলে আমি খুশি।

উত্তেজনার মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেছিল, পরে নিশ্চয় অনুশোচনা হয়েছিল। বললাম আমি।

অনুশোচনা! মিস মারপল বলল, কিন্তু মিঃ ভিকার আপনি কি বিশ্বাস করছেন লরেন্স খুন করেছে?

আচমকা এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকালাম। বলার চেষ্টা করলাম, ওই ধরা দেবার

–কিন্তু আমার ধারণা এই ঘটনায় তার কোন হাত নেই।

–তাই যদি হবে তবে এরকম অভিনয় করতে গেল কেন?

–অবশ্যই কারণ আছে। এসব কাজের পেছনে সবসময়ই কোন না কোন কারণ থাকে।

এর পর আগ্রহ সহকারে গতকাল সন্ধ্যার ঘটনাটা মিস মারপল আমার কাছ থেকে শুনে নিল। পরে বলল, আপনি দেখেছিলেন, লরেন্সকে উন্মাদের মত দেখাচ্ছিল? কিন্তু আমি বলতে পারি, ভাবনা চিন্তার পর কোন লোককে খুন করবার পরে কারো মুখের ভাব কখনোই অমন হবে না। খুনটা ছিল সুপরিকল্পিত।

-খুনের পরিবেশটা আমরা ঠিক জানি না, আমি বললাম, কথা কাটাকাটির সময় রাগের মাথায় হয়তো লরেন্স গুলি করে বসেছিল। পরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে হতভম্ব হয়ে গিয়ে ছিল। মনে হয়, এরকমই ঘটেছিল ঘটনাটা।

মিঃ ক্লেমেন্ট, আমার মনে হয় না ওদের মধ্যে কোন রাগারাগি হয়েছিল। আপনাদের বাড়ির মেরী তো বলেইছে, লরেন্স ওখানে বেশিক্ষণ ছিল না। ঝগড়া কথা কাটাকাটির জন্য একটা সময়ের দরকার।

তাছাড়া ভুলে যাচ্ছেন, মিঃ প্রথেরো যখন লিখছিলেন সেই সময় পেছন দিক থেকে তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল।

একটু পরেই লেটিস এলো। চেয়ারে বসে জানতে চাইল, শুনলাম লরেন্স রেডিংকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

-হ্যাঁ। গ্রীসলডা বলল।

-বাবাকে কেউ খুন করতে পারে এটা আমি কখনোই ভাবতে পারিনি। অবশ্য মুখে এমন কথা একসময়ে অনেককেই বলতে শুনেছি। আমি নিজেই তো বলেছিলাম।

অকম্পিত স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল লেটিস কথাগুলো। পরে সে গ্রীসলডার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জানতে এলাম তোমরা আমার টুপিটা এখানে পেয়েছ কিনা। কয়েকদিন ধরে সেটা পাচ্ছি না।

–মেরী বলতে পারে। ওই তো ঝটপাট দেয়। গ্রীসলডা বলল।

–দেখি তাহলে। বলে লেটিস উঠে দাঁড়াল।

–তুমি এখন ওটা থাকলেও পাবে না, আমি বললাম, মিঃ স্লাক ঘরটায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন। তা ওই সামান্য জিনিসটা এই সময়ে তোমার কাছে এত জরুরী হয়ে পড়ল?

–আপনি শোকের কথা বলছেন? আমার ওসব আসে না।

পরে ভ্রূকুটি করে বলল, আমার ধারণা সব ব্যাপারটাই আমার চানের পোশাকে ছবি আঁকাকে কেন্দ্র করে।

বলতে বলতে লেটিস চলে গেল।

মিস মারপল হাসছিলেন। বললেন, আমার মনে হয় প্রত্যেক ব্যাপারকেই তার নিজ ক্ষেত্রে এগোতে দেওয়া দরকার। মেয়েটা অন্য কোন ধান্দা মাথায় নিয়ে এসে অভিনয় করছিল।

এমন সময় মেরী এসে জানাল, কর্নেল, মেলচেট হলেন দেশের চীফ কনস্টেবল।

২. পুরো ঘটনাটা

০৬.

কিছুক্ষণ কথা বলার পর মিঃ মেলচেটের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা জানতে পারা গেল।

গতরাতে লরেন্স থানায় গিয়ে টেবিলে পিস্তল রেখে বলেছে, আমি নিজেই এসেছি, কর্নেল প্রথেরোকে আমি খুন করেছি।

খুন করার পেছনে অবশ্য যে কারণ দেখিয়েছে তা খুবই খেলো। জবানবন্দিতে বলেছে, সে ভিকারেজে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে পায়নি, কিন্তু দেখল প্রথেরো বসে আছে। তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, সে গুলি করে। কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলেনি।

একসময় চীফ কনস্টেবল মেলচেট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ ক্লেমেট, ব্যক্তিগত ভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। লরেন্স রেডিং কি লোকটার মেয়ের সঙ্গে গর্হিত কোন ব্যবহার করেছিল?

অবশ্য এর মধ্যে আমি মেয়েটাকে টেনে আনতে চাইছি না। তাই আপনার মত ওদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছ থেকে এটা জানতে চাইছি।

আমি পরিষ্কার ভাবে জানালাম যে এমন কোন ঘটনাই কখনো ঘটেনি।

মিঃ মেলচেট বললেন, জেনে খুশি হলাম। আচ্ছা চলি, একবার ডাঃ হেডকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

দুপা এগিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি যদি ইচ্ছে করি তার সঙ্গে যেতে পারি। আমি সম্মত হয়ে একসঙ্গেই ঘর থেকে বেরুলাম।

আমার বাড়ির কাছেই থাকেন ডাঃ হেডক। বসার ঘরেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিঃ মেলচেটকে দেখে একটা ছোট বাক্স এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, রাত জেগে আপনাদের কাজটা সেরে রেখেছি।

মিঃ মেলচেট বাক্স খুলে একটা বুলেট বার করে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আপন মনেই বললেন, এতো দেখছি মশার ২৫।

ডাঃ হেডক বললেন, হ্যাঁ। ঘটনাটা আকস্মিক আক্রমণই ছিল। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্য লাগছে, গুলি চলল অথচ কেউ শব্দ শুনতে পেল না।

মেলচেট বললেন, সেটা আমাকেও বিস্মিত করেছে। অন্তত বাড়ির কাজের মেয়েটার শুনতে পাবার কথা।

ডাঃ হেডক জানতে চাইলেন, আচ্ছা পড়ার ঘরের জানালাটা তো ভোলাই ছিল। মিস মারপল কিছু শুনতে পাননি? পাশেই তো থাকেন।

আমি বললাম, বোধহয় শুনতে পাননি। কেন না ঘটনার পরেই তিনি ভিকারেজে গিয়েছিলেন। কথাও হয়েছে আমার সঙ্গে কিন্তু ওরকম কিছু আভাস দেননি।

ডাঃ হেডক বললেন, শুনে থাকলেও হয়তো খেয়াল করেননি। স্বাভাবিক শব্দ বলে ভেবেছেন। অথবা পিস্তলে সাইলেন্সর লাগানো ছিল। খুনের কারণ কিছু বলেছে?

-খুবই মামুলি। ঝগড়া হয়েছিল। মিঃ মেলচেট বললেন।

-ঝগড়া করার মত কোন সময়ই ছিল না। আমি বললাম। চুপিসাড়ে এসে কাজটা সেরেছে। আমার সঙ্গে গেটের বাইরে দেখা হলে কথাও বলেছিল কেমন অসংলগ্ন...আপনি মিঃ প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করতে চান? হ্যাঁ, দেখা হবে। ওরকম কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

ডাঃ হেডক আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লরেন্স কখন গুলি করেছে বলে আপনার ধারণা?

-আমি বাড়িতে ঢোকার মিনিট কয়েক আগে।

–অসম্ভব। আমার পরীক্ষা তা বলে না। মিঃ প্রথেরো অনেক আগেই খুন হয়েছেন।

–কিন্তু ডাঃ হেডক, আপনি যে বললেন, আধঘণ্টা আগে ঘটনাটা ঘটেছে? মিঃ মেলচেট বললেন।

–হ্যাঁ, মোটামুটি সময় ওটা–দু-পাঁচ মিনিট এদিক সেদিক হতে পারে। কিন্তু এর বেশি নয়।

-কিন্তু আমি যখন ওখানে পৌঁছাই তখনো তো মিঃ প্রথেরোর দেহটা উষ্ণ ছিল।

আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখ হঠাৎ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

লরেন্স স্বীকার করেছে, খুনটা সে পৌনে সাতটার সময় করেছে।

উত্তেজনায় ডাক্তার আচমকাই উঠে দাঁড়ালেন। দৃঢ় স্বরে বললেন, এটা অসম্ভব। পৌনে সাতটার সময় খুন করেছে যদি বলে থাকে, তাহলে বলব লরেন্স মিথ্যা বলেছে। আমি একজন ডাক্তার হিসেবেই কথাটা আবারও বলছি।

মিঃ মেলচেটকে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো। তিনি বললেন, লরেন্স মিথ্যা বলেছে কিনা ওকে আরো একবার ভালকরে জেরা করলেই বোঝা যাবে সম্ভবত। চলুন দেখা যাক।

.

০৭.

পুলিস স্টেশনে আমি আর মিঃ মেলচেটই লরেন্সের মুখোমুখি হলাম। দেখলাম চিন্তাচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখে বসে আছে লরেন্স।

মিঃ মেলচেট তাকে বললেন, তুমি ইনসপেক্টর স্লাকের কাছে যে জবান বন্দি দিয়েছ তাতে বলেছ ভিকারেজে পৌনে সাতটা নাগাদ গিয়েছিলে। সেখানে প্রথেরোর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়, তুমি গুলি করে বেরিয়ে আস। তাই তো?

–হ্যাঁ।

এবারে তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

–আমি তো বলেইছি মিঃ প্রথেরোকে খুন করেছি। এর মধ্যে লুকনো কিছু নেই।

–বেশ ভাল কথা, তুমি পিস্তলটা কোথায় পেলে?

–আমার পকেটে ছিল। সঙ্গে নিয়েই ভিকারেজে এসেছিলাম।

–ওটা সঙ্গে রেখেছিলে কেন?

–সবসময়ই সঙ্গে থাকে। একটু যেন ইতস্তত করল লরেন্স।

–তুমি ঘড়ির কাটাটা পেছন দিকে সরিয়ে দিয়েছিলে কেন?

–ঘড়ি? কোথায়? লরেন্স স্পষ্ট তো-ই হতভম্ব হল।

–হ্যাঁ, ঘড়ির কাঁটা ছটা বাইশে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছিল।

একটা ভয়ের ছাপ পড়ল লরেন্সের মুখে। পরক্ষণেই বলে উঠল, ও হ্যাঁ, হা,–তা রেখেছিলাম।

-কর্নেল প্রথেরোর শরীরে কোন জায়গায় তুমি গুলি করেছিলে? ডাঃ হেডক জিজ্ঞেস করলেন।

-মনে হচ্ছে মাথায় করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মাথাতেই।

–তুমি নিশ্চিত নও?

–এসব অনর্থক প্রশ্ন। বিরক্ত হল লরেন্স।

এই সময় একজন কনস্টেবল এসে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সেটা খুলে দেখলাম কাগজে লেখা রয়েছে :

বুঝতে পারছি না কি করব। দয়া করে একবার আমার এখানে আসবেন। ভীষণ ভয় লাগছে-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবেন। তেমন কাউকে সঙ্গে আনতে পারেন। অ্যানা প্রথেরো।

চিঠিটা মিঃ মেলচেটের দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি চোখ বোলালেন। পরক্ষণেই আমরা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চিঠিটা লরেন্সেরও নজরে পড়েছিল। দেখলাম, চেহারাটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

মিসেস প্রথেরো আমাকে বলেছিলেন, তিনি খুব মরীয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি আর পারছেন না। কথাগুলো মনে হতেই লরেন্সের নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করবার একটা যুক্তি ততক্ষণে পরিষ্কার হল।

পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডাঃ হেডককে সঙ্গে নিয়েই আমরা ওল্ডহলের দিকে রওনা হলাম।

একজন চাকর আমাদের দরজা খুলে দিল। মিঃ মেলচেট বললেন, আমরা এসেছি, খবরটা ভেতরে দিয়ে এসো, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

চাকরটি ফিরে এলে মিঃ মেলচেট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে চাই। মিঃ প্রথেরো কাল খেয়েছিলেন?

-হ্যাঁ, অন্যদিনের মতই ।

–তারপর তিনি কি করলেন?

–মিসেস প্রথেরো শুতে চলে গিয়েছিলেন। আর মিঃ প্রথেরো পড়ার ঘরে গিয়ে বসেছিলেন।

-এরপর?

–লেটিস টেনিস খেলতে বেরিয়েছিল। আর সাড়ে চারটের সময় মিঃ এবং মিসেস প্রথেরো চা খান। পরে গাড়িতে করে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।

সময়টা মনে আছে?

-হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটা হবে। ওরা চলে যাবার পরেই মিঃ ক্লেমেন্টে ফোন করেছিলেন। আমি, বাড়ি নেই বলে দিয়েছিলাম।

–আচ্ছা, মিঃ রেডিং শেষ কবে এখানে এসেছে?

–মঙ্গলবার বিকেলে।

-সেদিন কি ওদের দুজনের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল?

-মনে হয়। উনি চলে যাবার পরে মিঃ প্রথেরো আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন, কোনদিন যেন বাড়িতে ঢুকতে না পায়।

–ওদের দুজনের কথাবার্তা কিছু শুনতে পেয়েছিলে?

–মিঃ প্রথেরো মাঝে মাঝে খুব জোরে কথা বলছিলেন। টুকরো টুকরো কথা কানে এসেছিল।

–তাতে কি বুঝতে পেরেছিলে, কি নিয়ে ঝগড়াটা হচ্ছে?

–মনে হল মিস প্রথেরোর ছবি আঁকা নিয়েই ঝগড়া বেঁধেছিল।

ঝগড়ার পরেই লরেন্স চলে গিয়েছিল?

–হ্যাঁ, আমি দরজা অবধি এগিয়ে দিয়েছিলাম।

–ওকে কি খুব রাগান্বিত দেখেছিলে?

–না।

সেদিন আর কেউ এসেছিল বাড়িতে?

-না, কেউ আসেন নি।

আগের দিন কেউ এসেছিল?

–হ্যাঁ, বিকেলে ডেনিস এসেছিল আর ডাঃ স্টোন। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একজন মহিলাও এসেছিলেন?

মহিলা? বিস্মিত হলেন মিঃ মেলচেট, মহিলাটি কে?

চাকরটি কয়েক মুহূর্ত কি মনে করবার চেষ্টা করল চুপ করে থেকে। পরে বলল, যতদূর মনে হয় তার নাম বলেছিল, মিসেস লেসট্রেঞ্জ।

-তিনি কখন এসেছিলেন?

–তখন সকলে রাত্রের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি মি: প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বললেন মিসেসকে খবর দেবার দরকার নেই।

-তারপর?

–মিঃ প্রথেরোকে খবর দিতে তিনি উঠে এসেছিলেন। আধঘন্টা মত দুজনের কথা হয়। চলে যাবার সময় মি: প্রথেরোই তাঁকে দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে মিসেস প্রথেরো একাই ছিলেন। মুখটা মলিন দেখাচ্ছিল। কিন্তু চোখ ছিল উজ্জ্বল। চিঠি পেয়েই চলে আসার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন।

পরে বললেন, চিন্তা করে দেখলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের বোঝা নামিয়ে দেওয়াই উচিত। মিঃ মেলচেট এসে ভালই করেছেন। আপনিই সেই লোক যার কাছে আমার কথাটা বলা উচিত। মিঃ প্রথেরোকে আমিই খুন করেছি।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে মিসেস প্রথেরোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মিঃ মেলচেট কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস প্রথেরো পুনরায় বলতে লাগলেন। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর থেকেই আমি চূড়ান্ত অসুখী জীবন যাপন করছিলাম। আমার স্বামীকে আমি ঘৃণা করতাম, হ্যাঁ ভীষণ। গতকাল আমি মনের জ্বালা মিটিয়েছি তাকে গুলি করে খুন করে। আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য মিঃ মেলচেট।

কথা শেষ করে তিনি চোখ বুজলেন।

–কিন্তু, ম্যাডাম, আপনি কি জানেন যে ইতিমধ্যেই মিঃ রেডিং মিঃ প্রথেরোকে খুন করেছে। বলে থানায় আত্মসমর্পণ করেছে?

–জানি। ও নির্বোধ। আমাকে পাগলের মত ভালবাসে। হয়তো এটা ওর মহত্ত্ব, কিন্তু চূড়ান্ত নির্বোধ।

লরেন্স কি জানতো যে আপনি খুন করেছেন?

–হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন মিসেস প্রথেরো।

–কি করে সে জানলো? আপনি বলেছিলেন?

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করলেন তিনি। পরে বললেন, হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম।

কিন্তু আপনি পিস্তল কোথায় গেলেন?

–পিস্তল? ওটা আমার স্বামীর। ওর ড্রয়ার থেকে ওটা বের করে নিয়েছিলাম।

–তারপর সেটা নিয়ে ভিকারেজে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, জানতাম, সেখানেই যাবার কথা আছে।

–তখন সময় কটা হবে?

–ছটা পনেরোর বেশি হবে না কিছুতেই।

–স্বামীকে খুন করবার জন্যই কি পিস্তলটা সঙ্গে করে নিয়েছিলেন?

–না না, ঠিক তা নয়। নিজের জন্যই নিয়েছিলাম।

–তাই বুঝি। তা ভিকারেজে গিয়ে কি করলেন? মিঃ মেলচেট জিজ্ঞেস করলেন।

ঘরে আর কেউ আছে কিনা দেখার জন্য প্রথমে জানালার কাছে গেলাম। কিন্তু কারোর গলার আওয়াজ পেলাম না। আমার স্বামী একাই বসেছিলেন দেখলাম। হঠাৎ মনে হল এটাই সুযোগ। আমি গুলি করলাম। তারপর সেখান থেকে চলে এলাম।

–ওখান থেকে এসেই কি মিঃ রেডিংকে বললেন?

এবারেও দেখলাম কেমন ইতস্তত করলেন। পরে বললেন, হ্যাঁ, সবকথা জানাই।

–আচ্ছা, সেই সময় ভিকারেজ থেকে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখেছিলেন?

-না। তবে ফেরার পথে মিস মারপলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি বাগানে ছিলেন। দাঁড়িয়ে দু-চারটা কথা বলেছি।

কথা শেষ করে মিসেস প্রথেরো সরাসরি মিঃ মেলচেটের দিকে তাকালেন। বললেন, সবকিছুই অকপটে স্বীকার করলাম। দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। এবার আপনি আপনার যা করণীয় করুন।

ডাক্তার হেডক উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে নাড়ী দেখলেন। নিচু স্বরে বললেন, আমি এখন এখানে থাকব মিঃ মেলচেট। আপনি এঁর একটা ব্যবস্থা যতক্ষণ না করছেন, এঁকে একলা থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না।

মেলচেট মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমরা দুজনে নিচে নেমে এলাম।

.

০৮.

পুলিস স্টেশন হয়ে আমাকে নিয়ে মিঃ মেলচেট উপস্থিত হলেন মিস মারপলের বাড়ি। আমি দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

মিস মারপলকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন বলেই চীফ কনস্টেবল এসেছিলেন। সে কথা শুনে মিস মারপল নীরবে সম্মতি জানালেন।

মিঃ মেলচেট বললেন, আপনার বাড়ি আর বাগানের দূরত্ব দেখে মনে হচ্ছে আপনি শুনলেও শুনতে পারেন। কাল সন্ধ্যাবেলা সন্দেহজনক কোন শব্দ কানে এসেছিল?

মিস মারপল বললেন, কাল বিকেল পাঁচটা থেকে আমি বাগানে ছিলাম। পাশের বাড়িতে কিছু হলে সেখান থেকে শোনা সম্ভব নয়।

–তবে একটা কথা। গতকাল কি কোন সময়ে মিসেস প্রথেরো এপাশ দিয়ে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ। তাকে যেতে দেখেছি। আমি ডেকেছিলাম। আমার বাগানের গোলাপ দেখে ও খুব। মুগ্ধ হয়েছিল।

-তখন সময়টা মনে আছে?

-তখন সোয়া ছটা বেজে মিনিট দুয়েক বেশি হয়েছে। খানিক আগেই চার্চের ঘড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

–বেশ, তারপর কি হল?

-মিসেস প্রথেরো আমাকে বলল, তার স্বামীকে ডাকতে ভিকারেজে এসেছে। ওকে আমি গলিটা দিয়ে আসতে দেখেছিলাম। যাওয়ার সময় গেল ভিকারেজের পেছন গেট দিয়ে বাগান পার হয়ে।

-উনি গলির দিক থেকে এসেছিলেন?

-হ্যাঁ। একটু পরেই তাকে বাড়ির কোণটা ঘুরে যেতে দেখলাম। মনে হয় মিঃ প্রথেরো এখানে ছিলেন না। যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল।

-তারপর?

–দেখলাম স্টুডিওটার দিকে চলে গেল। ওর ঘরটা মিঃ ক্লেমেন্ট রেডিংকে আঁকার কাজের জন্য দিয়েছিলেন।

–আপনি কোন গুলির শব্দ শুনতে পাননি? একটু আগে কি পরে?

-হ্যাঁ। সেই শব্দটা এসেছিল বনের দিক থেকে। মিসেস প্রথেরো চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পরে। আমি নিশ্চিত যে শব্দটা বনের দিক থেকেই এসেছিল।

-তারপর কি হল?

-তারপর মিঃ লরেন্সকে দেখলাম রাস্তা ধরে জঙ্গলের দিক থেকে আসছে। ভিকারেজের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল, চারদিক একবার সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখল

–আপনাকে দেখতে পেয়েছিল?

-মনে হল পায়নি। কেন না, ওই সময়েই আমি নিচু হয়ে এলিয়ে পড়া একটা ফুলগাছ ঠিক করে দিচ্ছিলাম। পরে দেখলাম গেট দিয়ে ঢুকে স্টুডিওর দিকে যাচ্ছে।

–মিঃ লরেন্স তাহলে বাড়িটার কাছে যায়নি?

-না। স্টুডিওর দিকেই চলে গিয়েছিল। ওর সাড়া পেয়েই বোধহয় মিসেস প্রথেরো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর ওরা দুজনে ঘরে চলে গেল।

-কতক্ষণ পরে ওরা স্টুডিওর থেকে বেরিয়ে আসে?

–মিনিট দশেক পরেই। চার্চের ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজতে শুনেছিলাম। গেট দিয়ে বেরিয়ে ওরা গলিতে চলে আসে। ঠিক সেই সময়েই বনের দিকে রাস্তা দিয়ে? আসতে চোখে পড়ল। তিনি এসে এদের দুজনের সঙ্গে যোগ দিলেন। তারপর তিনজনে মিলে গ্রামের দিকের রাস্তা ধরে চলে গেলেন।

একটানা কথাগুলো বলে একটু থামলেন তিনি। পরে বললেন, আমার ধারণা রাস্তাটার প্রান্তে আসার পরে ওদের সঙ্গে মিস ক্রেমের সঙ্গে দেখা হয়। মিস ক্রেমই হবে, ওর পরণের ভীষণ ছোট স্কার্টটা আমি চিনতে পেরেছিলাম। মিস ক্রেমও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

–আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে হয় মিস মারপল। আচ্ছা, মিসেস প্রথেরো আর রেডিং–এর হাঁটাচলার মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েছিল আপনার?

–অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, ওদের মনের অবস্থা বা ভাবভঙ্গী কেমন ছিল, তাই তো?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

–ওরা খুব স্বাভাবিকভাবেই গল্প করতে করতে হাঁটছিল। আচ্ছা, মিসেস প্রথেরো কি স্বীকার করেছে, যে খুনটা সেই করেছে?

মিঃ মেলচেট বিস্মিত স্বরে বললেন, আশ্চর্য! আপনি আঁচ করলেন কি ভাবে?

-এটাই তো স্বাভাবিক, হাসলেন মিস মারপল, কিন্তু ঘটনাটা ঠিক নয়। মিসেস প্রথেরোর মত মহিলার পক্ষে এমন ঘটনা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা, কি দিয়ে খুন করেছে বলে বলেছে?

-পিস্তল দিয়ে।

–কোথায় পেল সেটা?

–ওটা নাকি সঙ্গে করে এনেছিল।

মিস মারপল হঠাৎ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, না, না ও সঙ্গে করে কোন পিস্তল আনেনি। ওই ধরনের কিছুই ওর সঙ্গে ছিল না।

মিঃ মেলচেট কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন। পরে বললেন, এমনতো হতে পারে, হাতব্যাগে অস্ত্রটা ছিল?

মিস মারপল বললেন, ওর সঙ্গে কোন হাত ব্যাগই ছিল না।

মিঃ মেলচেট হঠাৎ বলে উঠলেন, আমি দেখছি উল্টে পড়া ঘড়ির সময় ছটা বাইশের সঙ্গে এই ঘটনাগুলো বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

মিস মারপল আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়িটা সম্পর্কে মিঃ মেলচেটকে এখনো কিছু

ঘড়ির কি ব্যাপার? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ মেলচেট।

এবারে ঘড়ির ব্যাপারটা প্রকাশ করবার একটা সুযোগ আমি পেলাম। শুনে মিঃ মেলচেট বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়িটা যে ফার্স্ট যায় এই কথাটা গতকাল আপনি ইনসপেক্টর শ্লাককে কেন জানাননি?

–আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ইনসপেক্টর আমাকে সেই সুযোগ দেননি।

মিঃ মেলচেট মাথা নত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে বললেন, দুজন পরপর খুনের কথা স্বীকার করেছে, আরও দু-একজন যদি একই দাবি নিয়ে হাজির হয়, তাহলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মিস মারপল মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললেন, আমি আপনাকে একটা পথ বাতলাতে পারি। রেডিং নির্দোষ একথা যদি মিসেস প্রথেরোকে আর মিসেস প্রথেরো নির্দোষ এই কথাটা রেডিংকে বোঝাতে পারা যায় তাহলে দেখবেন ওরা দুজনেই সত্যি কথাটা প্রকাশ করবেন। ওদের সত্য জবানবন্দি আপনাদের পক্ষে খুবই সাহায্যকারী হবে।

মিঃ মেলচেট বললেন, তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মিঃ প্রথেরোকে খুনের ব্যাপারে ওদের দুজনকে সন্দেহ করা যায়। দুজনেরই স্বার্থ রয়েছে এতে।

মিস মারপল বললেন, আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি।

-তবে আপনি কি অন্য কাউকে সন্দেহ করেন?

মিস মারপল হাসলেন। বললেন, একজন কি বলছেন, আমি অন্তত এমন জনা সাতেকের নাম বলতে পারি, যাদের প্রত্যেককেই এই খুনের জন্য দায়ী বলে মনে হতে পারে।

মিঃ মেলচেট কথাটা শুনে মিস মারপলের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, আপনি বলছেন কি! এরা সবাই কি এই সেন্ট মেরী মিড-এরই বাসিন্দা?

মিস মারপল হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়লেন।

.

০৯.

মিঃ মেলচেটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ভিকারেজে ফিরে এলাম। বসার ঘরে দেখলাম গ্রীসলডা মিস ক্রেমের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। গ্রীসলডা জানাল, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উনি এসেছেন।

মিস ক্রেম গ্রীসলডার কথার সূত্র ধরে বলল, এমন বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মিঃ ক্লেমেট যে ভাবতে পারছি না। ভাবলাম, আপনার এখানে এলে হয়তো সবকিছু জানতে পারব। আমি ঠিকই করে নিয়েছি, এ ব্যাপারে যথাসাধ্য আমি সহযোগিতা করব। যাই হোক, এদিককার ঘটনা কিছু বলুন, সারাদিনই তো আপনি পুলিসের সঙ্গে কাটালেন। পুলিস কি ভাবছে?

মিস ক্রেমের কৌতূহল আমাকে চমৎকৃত করল। ধীরে ধীরে বললাম, পুলিস এখনো কিছু ঠিক করতে পারছে না।

-তাহলে কি ওরা মিঃ রেডিংকে আর আসামী বলে ভাবছে না? অমন সুন্দর চেহারার একটা মানুষ, কি সুন্দর মুখের হাসি, আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করেছে।

-পুলিসের জন্য কিছু করতে হয়নি। লরেন্স রেডিং নিজেই গিয়ে পুলিসের কাছে অপরাধ স্বীকার করেছে।

–সেকি! মিস ক্রেম বিস্মিত হলেন, সত্যি সত্যি যে খুন করে সে কি কখনো এমন করে ধরা দেয়। এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। এরপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। মিঃ প্রথেরোকে খুন করেছে কেন, সেই ঝগড়ার জন্য?

আমি বললাম, খুনটা যে সেই করেছে, সে-ব্যাপারে এখনো কেউ নিশ্চিত নয়। বললাম আমি।

–তবু, দোষ যখন স্বীকার করেছে, তার কারণও নিশ্চয় কিছু দেখিয়েছে?

–হ্যাঁ। কিন্তু পুলিস তা বিশ্বাস করেনি।

-যত্তসব উদ্ভট ব্যাপার দেখছি। না, এবারে উঠছি। দেখি মিঃ স্টোন কি করছে। রেডিং-এর গ্রেপ্তারের খবরটা শুনলে উনিও অবাক হবেন।

গ্রীসলডা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, কৌতূহল মেটাবার জন্যই মেয়েটা এখানে এসেছিল, আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে। কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

যাকগে ওসব। আমি তখন থেকে হাঁ করে আছি, এবারে আমাকে সব খুলে বল।

আমি সকলের সমস্ত ঘটনা ওকে খুলে বললাম। শুনে ও বলল, প্রেমটা তাহলে লরেন্স আর অ্যানার মধ্যে।

আমরা আরো লেটিসকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে মরছি। গতকাল মিস মারপল এরকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল মনে পড়ছে।

–হ্যাঁ। আমি বললাম।

এরপর আমি মেরীকে ডেকে পাঠালাম। ওকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।

মেরী এলে বললাম, আচ্ছা মেরী, মনে করে দেখতো কাল সন্ধ্যাবেলা কোন গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে কিনা।

মেরী বলল, ও রকম কিছুই শুনিনি। তাহলে তো আমি উঁকি মেরে দেখতাম কি হয়েছে।

–কিন্তু মিস মারপল বলছেন, বনের দিক থেকে একটা শব্দ শুনেছিলেন। গুলির শব্দ না হোক, মনে করে দেখতো, অন্য কোন রকম শব্দ তুমি শুনেছিলে কিনা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে হল মেরী মনে করবার চেষ্টা করছে। পরে বলল, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেরকম একটা শব্দ কানে এসেছিল বটে।

–তখন সময় কটা হবে?

–তা ঠিক ঠিক বলতে পারব না। তবে চা পানের পরে যে ওটা শুনেছি তা নিশ্চিত।

–ঠিক ঠিক না হলে, কাছাকাছি সময়টা বলতে পারবে না।

-তা বলতে পারব না। কাজে ব্যস্ত থাকি, ঘড়ির দিকে সারাক্ষণ নজর রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

–মিঃ লরেন্স এখানে আসার অনেক আগেই কি শব্দটা তুমি শুনেছিলে?

–হ্যাঁ, তা বলতে পারব। এই মিনিট দশ পনেরো আগে হবে।

-ঠিক আছে, তুমি কাজে যাও।

বৈঠকখানায় বসেই গ্রীসলডার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

একটু পরেই মেরী এসে জানাল, মিঃ মেলচেট এসেছেন। পড়ার ঘরে বসে আছেন।

.

১০.

পড়ার ঘরে এসে দেখলাম, ইনসপেক্টর স্লাক এবং মিঃ মেলচেট উপস্থিত। ইনসপেক্টরের মুখ গম্ভীর। মেলচেটের মুখে রাগ রাগ ভাব।

ওদের সঙ্গে কথা শুরু করেই বুঝতে পারলাম, দুজনের মধ্যে মতের অমিল ঘটেছে।

মেলচেট বলল, মিঃ রেডিং-এর নির্দোষিতা মিঃ স্লাক মেনে নিতে পারছেন না।

মিঃ স্লাক বললেন, ও যদি খুনই না করবে তাহলে সেধে অমন করে ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে চাইবে কেন?

মেলচেট বললেন, মিসেস প্রথেরোও তো ওই একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

-ওটা স্ত্রীলোকেদের আবেগ বলেই ধরে নেওয়া যায়। আবেগের মাথায় ওরা ওরকম অনেক কাণ্ডই করে। কিন্তু রেডিং-এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। খুন করার পর ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ও যে অপরাধ করেছে তার প্রমাণ পিস্তল। ওটাকে তো অস্বীকার করা যায় না।

-তাহলে কি বলতে চাও রেডিং মিঃ প্রথেরোকে সাড়ে ছটার সময় গুলি করেছে?

–না, তা নয়।

–ওই সময়ে রেডিং-এর গতিবিধি তুমি খুঁটিয়ে দেখেছ?

-অবশ্যই। শোন তাহলে বলি, ছটা বেজে যখন দশ, তখন রেডিং গ্রামে ছিল। সেখান থেকে পেছনের রাস্তা দিয়ে যখন সে আসে তখনই মিস মারপলের চোখে পড়ে। এই মহিলাটি খুব একটা ভুল যে করেন না তাতো জানই।

যাই হোক, মিসেস প্রথেরো তার বাগানের স্টুডিও ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। রেডিং সেখানে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে।

সাড়ে ছটা নাগাদ তারা আবার স্টুডিও ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে চলে যায়। রাস্তার শেষ প্রান্তে ওদের সঙ্গে দেখা হয় ডঃ স্টোনের।

একটানা অতগুলো কথা বলে ইনসপেক্টর দম নেবার জন্য একটু থামলেন। পরে বললেন, এরপর পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর মিসেস প্রথেরো মিস হার্টনেলের বাড়ি যান বাগান বিষয়ে একটা বই আনতে। সেখানে তিনি সাতটা অবধি ছিলেন।

সেই সময় মিসেস প্রথেরোর ভাবভঙ্গী কেমন ছিল?

–মিস হার্টনেলের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি খুব স্বাভাবিক মেজাজেই তিনি ছিলেন।

–বেশ, তারপর বলে যাও।

-মিসেস প্রথেরো চলে গেলে রেডিং ডঃ স্টোনের সঙ্গে ব্লু-বার-এ যায়। একসঙ্গে মদ খায়। সেখান থেকে ডঃ স্টোনকে বিদায় দিয়ে রেডিং সোজা চলে আসে ভিকারেজের দিকে। তখন সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট। তখন অনেক লোকই তাকে দেখেছে।

-তারপর?

–স্টুডিও ঘর থেকে সদর দরজায় এসে ভিকার-এর খোঁজ করে। জানতে পারে ভিকার নেই এবং মিঃ প্রথেরো পড়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে রেডিং সেখানে চলে আসে, ভেতরে ঢুকে গুলি চালায়।

ঠিক যে ভাবে সে জবানবন্দিতে বলেছে, এটাই হল প্রকৃত ঘটনা।

মেলচেট বলল, তাহলে তো ডাঃ হেডকের সাক্ষ্যটাকে অগ্রাহ্য করতে হয়। তিনি জানিয়েছেন খুনটা করা হয়েছে সাড়ে ছটার মধ্যেই। তার বেশি কিছুতেই নয়।

–আজকাল ডাক্তাররা অনেক ভুলভাল করে। বললেন ইনসপেক্টর।

–এটাতো কোন রুগী দেখার ব্যাপার নয়, শ্লেষের সুরে বললেন মিঃ মেলচেট, মৃতের সরকারী ডাক্তারী রিপোর্ট তুমি অগ্রাহ্য করতে পার না।

আমি বললাম, আমার সাক্ষ্যটাও অগ্রাহ্য করবার নয়। আমি ছুঁয়ে দেখেছি। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। আমার যে ভুল হয়নি শপথ করে বলতে পারি।

-তাহলে ভেবে দেখ স্লাক। বললেন মিঃ মেলচেট।

–তাহলে তো আর বলার কিছু থাকছে না আমার। বলতে হবে এটা একটা মজাদার কেস। রেডিংকে আর ফাঁসিতে ঝুলতে হবে না।

একটু থেমে পরে বললেন, একটা কাজ করা যাক। ফের গোড়া থেকে জেরা শুরু করা যাক।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, ঘড়ির ব্যাপারটা আমাকে আপনার আগে জানানোই উচিত ছিল।

আমি মিঃ মেলচেটকে যে কৈফিয়ত দিয়েছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি শোনালাম তাকে।

শুনে বিরক্ত হয়ে মিঃ স্লাক বললেন, যাই হোক, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা আমাকে জোর করেই শোনানো যেত।

যাই হোক, মিঃ মেলচেট বললেন, এখন আমাদের প্রথম কাজ মিসেস প্রথেরো ও রেডিং-এর কাছ থেকে সত্যি কথাগুলো জানা।

তাই সাব্যস্ত হল শেষ পর্যন্ত। মিঃ মেলচেট ডাঃ হেডককে ফোন করে জানালেন মিঃ প্রথেরেকে নিয়ে ভিকারেজে চলে আসার জন্য।

আর মিঃ স্লাক থানায় জানিয়ে দিলেন লরেন্স রেডিংকে নিয়ে আসার জন্য।

ফোনের কাছ থেকে সরে এসে মিঃ স্লাক বললেন, তাহলে এই ঘরেই আমরা কাজ শুরু করব।

আমি বললাম, তাহলে আমার তো এখানে না থাকাই উচিত।

–তবে রেডিংকে নিয়ে এলে ইচ্ছে করলে আপনি আসতে পারেন। আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বন্ধুর মত, সত্য কথা বের করতে আপনার প্রভাব কাজ দেবে।

আমি অতঃপর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

৩. লরেন্স রেডিং পৌঁছানোর পর

১১.

লরেন্স রেডিং পৌঁছানোর পর আমার ডাক পড়ল। পড়ার ঘরে এসে লরেন্সকে দেখে কেমন উদভ্রান্তের মত মনে হল। আমাকে দেখে ম্লান মুখে হাসল।

চীফ কনস্টেবল মিঃ মেলচেট লরেন্সকে বলল, কয়েকটা প্রশ্ন করব বলেই তোমাকে এখানে আনানো হয়েছে।

আচ্ছা, তুমি কি জান যে আরও একজন মিঃ প্রথেরোকে খুন করেছে বলে আমাদের কাছে স্বীকার করেছে?

–আরো একজন, বিস্মিত হল লরেন্স, কে কে সে?

–মিসেস প্রথেরো।

–অসম্ভব। এটা একেবারেই অসম্ভব। অ্যানা এটা করতেই পারে না।

–আমরাও অবশ্য তার কথা বিশ্বাস করি না, বললেন মিঃ মেলচেট, অবশ্য তোমার কথাগুলোও আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি।

খুনের যে সময়টার কথা তুমি বলেছ, ডাঃ হেডক বলেছেন, তা হতে পারে না। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন।

–ডাঃ হেডক সেরকম বলেছেন নাকি?

-হ্যাঁ। ডাক্তারের কথা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। এখন আমরা আশা করব, সত্যি কথাটা বলে তোমরা আমাদের সাহায্য করবে।

লরেন্স মাথা নত করে চিন্তা করতে লাগল। বার কয়েক ইতস্তত করে পরে বলল, মিসেস প্রথেরোর ব্যাপারে আমাকে মিথ্যা কথা বলছেন না তো? আপনি কি সত্যি ওকে সন্দেহ করেন?

–না, মোটেই না।

-আমি একটা আস্ত বোকা, লরেন্স বলে উঠল, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে সে এটা করেছে।

–কি হয়েছিল, তুমি আমাদের খুলে বল।

–বেশি কিছু বলার নেই। সেই বিকেলে আমি মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করি।

–ওই ব্যাপারটা আমরা জানি। তোমাদের দুজনের সম্পর্কের কথাটা অনেকেই জানতো।

–হয়তো। লরেন্স আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি সবকথাই খুলে বলছি।

একটু থেমে সে ফের বলতে শুরু করল, বিকেলে সওয়া ছটার সময় আমি স্টুডিও ঘরে মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করি।

আমি এখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই কথাটা তাকে জানাই। ও স্বীকার করে, সাময়িকভাবে আমার সরে থাকাই ভাল।

–তারপর? আমি বললাম।

–আমরা স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ স্টোনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এরপর ডাঃ স্টোনের সঙ্গে আমি ব্লু-বার-এ গেলাম। মদ খেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাবার কথাই মনে হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পরে ভাবলাম, এখানে এসেছি যখন একবার ভিকার-এর সঙ্গে দেখা করে যাই।

ওই অবধি বলে লরেন্স চোখ বুঝল। মনে মনে পরের ঘটনাগুলো সম্ভবতঃ সাজিয়ে নিল।

লরেন্স ফের বলতে শুরু করল, ভিকারেজে দরজার কাছেই ঝি-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুনলাম ভিকার নেই, তবে ফিরে আসবেন শিগগিরই।

আরো শুনলাম, মিঃ প্রথেরো ভিকারের জন্য পড়ার ঘরে অপেক্ষা করছেন। আমিও অপেক্ষা করব ভেবে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

-তারপর? মিঃ মেলচেট উদগ্রীব হলেন।

–দেখলাম মিঃ প্রথেরো লেখার টেবিলে বসে আছেন। আমি এগিয়ে গেলাম, তাকে ছুঁলাম, বুঝতে পারলাম দেহে প্রাণ নেই।

নিচের দিকে চোখ পড়তে মেঝেয় চেয়ারের একপাশে পিস্তলটা চোখে পড়ল। সেটা তুলে হাতে নিয়েই বুঝতে পারলাম, আমার পিস্তল।

–এরপর তুমি কি করলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

–এখানে ওই অবস্থায় আমার পিস্তলটা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসে গেল, নিশ্চয়ই মিসেস প্রথেরো কোন সময়ে আমার পিস্তলটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। হয়তো ভেবেছিল, অতিষ্ট হয়ে উঠলে সেটা নিজের ওপরই ব্যবহার করবে। আমার ধারণা হল, আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও এখানেই এসেছিল। তারপর...উঃ। আমি আর ভাবতে পারছি না মিঃ ক্লেমেন্ট।

বলতে বলতে অসহিষ্ণুভাবে মাথা চেপে ধরল লরেন্স।

স্বাভাবিক। সহানুভূতির সুরে বললাম আমি।

–তারপর তুমি কি করলে? মিঃ মেলচেট জানতে চাইলেন।

–আমি তৎক্ষণাৎ পিস্তলটা পকেটে পুরে ফেললাম। ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের মুখে আসতেই মিঃ ক্লেমেন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি কথা প্রসঙ্গে জানালেন প্রথেরোর সঙ্গে তার দেখা করবার কথা আছে।

আমার তখন মানসিক অবস্থা এমন যে কি করছি কি বলছি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

আমার আচরণের অস্বাভাবিকতা দেখে যে ভিকার আশ্চর্য হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

আমি সেখানে আর দাঁড়াতে পারিনি। ছুটে রাস্তায় এসে উদভ্রান্তের মত রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছে, অ্যানা যদি এটা করেই থাকে, তাহলে তার জন্য পরোক্ষ ভাবে আমিই দায়ী। শেষে মরীয়া হয়ে পুলিসের কাছে গিয়েছি।

লরেন্সের কথা শেষ হলেও অনেকক্ষণ আমরা কেউই কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর একসময় মিঃ মেলচেট নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বললেন, আচ্ছা রেডিং একটা কথা, টেবিলের ওপরে মৃতদেহের আড়ালে পড়ে থাকা কোন চিরকুট কি তোমার চোখে পড়েছিল?

–না, তেমন কিছু দেখতে পাইনি।

–কোন কারণে ঘড়িটায় কি হাত দিয়েছিলে?

-না, সেটা ধরবার কোন কারণই ঘটেনি। তবে চোখে পড়েছিল টেবিলের ওপর উল্টে পড়ে আছে।

মিঃ মেলচেট একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, এবারে মনে করতে পারছ কিনা দেখতে, পিস্তলটা তুমি শেষ কবে দেখেছিলে?

লরেন্স একটু চিন্তা করল। এরপর বলল, এটা ঠিকভাবে বলা শক্ত।

–বেশ, ওটা সাধারণত তুমি কোথায় রাখতে?

-বুককেসের ওপরের তাকেই সাধারণত রাখতাম। তবে খুব যত্নে যে থাকত তা নয়। পিস্তলটার ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না কোন কালেই।

-তাহলে তো দেখছি তোমার বসার ঘরে যে কেউই সেটা দেখতে পেত?

–হ্যাঁ। তা সম্ভব ছিল।

–তাহলে শেষ ওটা কবে দেখেছ, সঠিক বলতে পারছ না?

জবাবে মাথা নাড়ল লরেন্স। পরে কি চিন্তা করে বলল, যতদূর মনে করতে পারছি, গত পরশু পর্যন্ত পিস্তলটা ওই তাকের ওপরেই দেখেছি। ব্যাপারটা মনে আছে এই জন্য যে ওটা সরিয়ে সেদিন একটা পাইপ বার করেছিলাম।

–আর একটা কথা, সম্প্রতি তোমার বাড়িতে কে কে গেছে?

–অনেকেই তো যাচ্ছে আসছে, কার কথা বলব! তবে গত পরশু আমি একটা টি-পার্টি দিয়েছিলাম। সেদিন অনেকেই আমার ওখানে গিয়েছিল।

–বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় কি তুমি দরজায় চাবি লাগিয়ে যাও?

–একদম না। দরকারই হয় না। চুরি হবার মত কোন জিনিসই তো আমার ঘরে নেই। তাছাড়া এখানে কেউ তেমন করেও না।

-তোমার ঘরদোর দেখাশোনা করে কে?

-মিসেস আর্চার নামে বৃদ্ধা এক মহিলা। সে পিস্তলের ব্যাপার কিছু বলতে পারবে না। তবে ইচ্ছে করলেই যে-কেউ আমার ঘর থেকে পিস্তলটা সরিয়ে ফেলতে পারে।

ঠিক এমনি সময়ে মিসেস প্রথেরোকে নিয়ে ডাঃ হেডক উপস্থিত হলেন। লরেন্স আর মিসেস প্রথেরো পরস্পরকে দেখে বিস্মিত হলেন।

মিসেস প্রথেরো মিঃ মেলচেটকে জিজ্ঞেস করলেন, একটু আগে ডাঃ হেডকের কাছ থেকে যা শুনলাম তা কি সত্যি?

মেলচেট বললেন, হ্যাঁ, মিসেস প্রথেরো। রেডিং এখন সন্দেহমুক্ত। এখন আমরা আপনার কথা শুনতে চাই।

মিসেস প্রথেরো আমার মুখের দিকে একপলক তাকালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, হা সবই বলছি খুলে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা লরেন্স রেডিং-এর সঙ্গে তার স্টুডিও ঘরে আমার দেখা করার কথা ছিল।

সওয়া ছটা নাগাদ আমি আর আমার স্বামী গাড়ি করে গ্রামে যাই। আমার কিছু কেনাকাটার দরকার ছিল।

আমরা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই সেই সময়ে তিনি বলেছিলেন যে ভিকারের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। শুনে আমার একটু অস্বস্তি হয়েছিল। আমাকেও তো লরেন্সের স্টুডিওতে যেতে হবে। ভিকারেজে স্বামীর উপস্থিতিতে আমাকে যেতে হবে, এটাই ছিল অস্বস্তির কারণ।

-তারপর?

–আমার স্বামী সম্ভবত বেশিক্ষণ ভিকারেজে ছিলেন না। যাই হোক, আমি পেছনের রাস্তাটা দিয়ে বাগানে ঢুকেছিলাম। ভেবেছিলাম, তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে মিস মারপল ডাকল। বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে হল।

মিস মারপলের সঙ্গে কথা বলে ভিকারেজ পার হয়ে পেছনদিক দিয়ে ঘুরে ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

ভেতরে কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। তখন গুঁড়ি মেরে উঁকি মারলাম। কিন্তু দেখলাম, ঘর ফাঁকা–কেউ নেই।

এরপর আমি স্টুডিও ঘরে চলে এলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লরেন্স এসে হাজির হল।

–পড়ার ঘরটাতে আপনি কাউকেই বসে থাকতে দেখেননি?

–না। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলাম, সেখানে আমার স্বামী ছিলেন না।

চীফ কনস্টেবল মিঃ মেলচেট নীরবে কি ভাবলেন। পরে বললেন। কিছু মনে করবেন না মিসেস প্রথেরো, আপনি কি ভাবে কি করেছিলেন, দয়া করে একবার আমাদের দেখাবেন?

–বাধা কি আছে। বেশ, দেখাচ্ছি। মিসেস প্রথেরো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ইনসপেক্টর স্লাক এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। সেটা দিয়ে বেরিয়ে মিসেস প্রথেরো ঘরে পেছনের জানালার দিকে গেলেন।

ইনসপেক্টর লেখার টেবিলে গিয়ে বসার জন্য আমাকে ইশারা করলেন।

আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। তবু ধীরে ধীরে লেখার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

একমিনিট পরেই কানে এলো একজোড়া পায়ের শব্দ। কিছুক্ষণ থেমে রইল। তারপরেই শব্দটা আবার ফিরে গেল।

ইনসপেক্টর স্লাকের নির্দেশে লেখার টেবিল থেকে আমি আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস প্রথেরো ঘরে ফিরে এলেন।

-ঠিক এভাবেই আপনি এসেছিলেন? মিঃ মেলচেট জিজ্ঞেস করলেন।

–হ্যাঁ, অবিকল এইভাবে।

–আচ্ছা এবারে বলুনতো, আপনি যখন জানালা দিয়ে তাকালেন, তখন ভিকার কোথায় ছিলেন?

–ভিকার? মাপ করবেন, আমি ভিকারকে দেখতেই পাইনি।

ইনসপেক্টর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, বুঝতে পারা গেল। এই জন্যেই আপনি সেদিন আপনার স্বামীকে ঘরে দেখতে পাননি। সেদিন মিঃ প্রথেরো লেখার টেবিলে ছিলেন।

–ও ওখানে...। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকালেন মিসেস প্রথেরো।

–হ্যাঁ, মিসেস প্রথেরো, আপনি যখন জানালা দিয়ে তাকান সেই সময় মিঃ প্রথেরো ওখানেই বসেছিলেন। যাই হোক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। আচ্ছা, রেডিং-এর যে একটা পিস্তল আছে আপনি কি জানতেন?

-হ্যাঁ। একবার আমাকে বলেছিল।

–সেটা কোথায় থাকতো তা কি আপনি জানতেন?

–তা ঠিক জানতাম না। তবে ওর ঘরে বুক কেসের ওপর সেটা চোখে পড়েছে।

পিস্তলটা শেষ করে আপনার চোখে পড়েছে, মনে করতে পারেন?

–সম্ভবতঃ হপ্তা তিনেক আগে। সেদিন আমি আর আমার স্বামী ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে। গিয়েছিলাম।

-তারপর আর ওখানে যাননি?

–না। সাধারণতঃ আমি লরেন্সের বাড়িতে যাই না।

–তাহলে আপনাদের দেখা হত কোথায়?

–ওল্ডহলেই ও আসত। লেটিসের একটা ছবি আঁকায় হাত দিয়েছিল। এছাড়া বনের মধ্যে প্রায়ই দেখা হত আমাদের।

মেলচেট এবারে বললেন, না, আমার আর কিছু জানার নেই। আপনি এখন যেতে পারেন। আমাদের সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ।

ডাঃ হেডক মিসেস প্রথেরোকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লরেন্স রেডিং-ও তাদের সঙ্গে গেল।

মিঃ মেলচেট বললেন, ওই চিরকূটটাই মনে হচ্ছে আমাদের পথ দেখাবে। লক্ষ্য করে দেখুন, চিঠির কথাগুলো অন্য কালিতে লেখা। আর মাথায় যে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেই লেখাটার কালি অন্যরকম। চিরকূটে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল?

ইনসপেক্টর স্লাক বললেন, ওতে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে এমন আশা করা বৃথা। তবে পিস্তলে লরেন্স রেডিং-এর আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। তবে সবচেয়ে রহস্যজনক আমার মনে হচ্ছে গুলির শব্দটা। যদি গুলির শব্দ হয়েই থাকে তাহলে তা কারোর না কারোর কানে আসবেই।

কর্নেল মেলচেট বললেন, মিস মারপল শব্দটা শুনেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঘটনাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। সমস্ত ঘটনাগুলোর পেছনেই এমন একটা প্রেক্ষাপট লুকিয়ে আছে। আমার ধারণা, আমরা এখনো পর্যন্ত তার নাগাল ধরতে পারিনি।

আমাদের চোখের সামনের জিনিসগুলো যেমন ঘড়ি, চিরকূট, পিস্তল, এসবগুলোর অন্য কোন অর্থ থাকা অসম্ভব নয়।

-তাহলে এখন তুমি কি করতে চাইছ? জানতে চাইলেন ইনসপেক্টর।চল একবার মিসেস প্রাইস রিডলের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ইনসপেক্টর আপত্তি করলেন না। আমাকেও তারা সঙ্গে নিয়ে চললেন।

.

১২.

মিসেস প্রাইস রিডলে বাড়িতে ছিলেন না। চাকর বলল পুলিস স্টেশনে গেছেন। আমরাও পা বাড়ালাম সেদিকে।

পুলিস স্টেশনেই তার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বেশ উত্তেজিত অবস্থাতেই ছিলেন। তার কাছ থেকে জানা গেল কেমন একটা বিকৃত অদ্ভুত স্বরে কে তাকে টেলিফোনে শাসিয়েছে।

কথাগুলো তাকে কি বলা হয়েছিল জানতে চাইলে মিসেস রিডলে বললেন, কথাগুলো মনে করতেও আমার শরীরে কাটা দিয়ে উঠছে। বলল, তুমি একটা পরনিন্দুক নচ্ছার মেয়েছেলে। এবারে তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। ভুলে যেও না তোমার পেছনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড লেগেছে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাও, নইলে মহা বিপদে পড়বে। মিঃ মেলচেট এসব কি কোন কথা হলো? সে কি ভয় ধরানো গলার স্বর!

-তারপর?

–আমি যেই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে কথা বলছো, অমনি বলল, একজন প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তারপরই শুনলাম ফোনটা নামিয়ে রাখল।

একমুহূর্ত বিরতির পরে মিসেস রিডলে ফের বললেন, ফোনটা পেয়ে এমনই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি যে বনের দিক থেকে একটা গুলির আওয়াজের মত শব্দ কানে আসতেই ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলাম।

ইনসপেক্টর স্লাক সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন-বন থেকে গুলির শব্দ?

-হ্যাঁ। বেশ জোরেই হয়েছিল শব্দটা মনে হল। অবশ্য তখন আমার মানসিক অবস্থাও খুব উত্তেজিত ছিল। তার জন্যও খুব জোরে বলে মনে হতে পারে।

মিঃ মেলচেট বলল, ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।

আমি বললাম, এমনও হতে পারে, কেউ আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছে।

মিসেস রিডলে কুঞ্চিত করে প্রথমে আমার দিকে তাকালেন। পরে মিঃ মেলচেটকে বললেন-সম্প্রতি গ্রামটায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে চলেছে। অদ্ভুতভাবে মারা গেলেন কর্নেল প্রথেরো। এরপর কার পালা কে জানে হয়তো আমারই হবে।

মিসেস রিডলে বিদায় নিলেন। ইনসপেক্টর স্লাক চিন্তিতভাবে বললেন, গুলির একটা শব্দ যে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোট তিনজন শব্দটা শুনেছে বোঝা যাচ্ছে। শব্দটার উৎস এবার অনুসন্ধান করতে হবে।

তাছাড়া টেলিফোনের ব্যাপারটাও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

পরে আবার বললেন, এরকম একটা চোরা টেলিফোন খুনের ঘটনার দিন ভিকারকে অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

মেলচেট মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ইনসপেক্টর বললেন, খুনের দিন ওই সময়টায় অর্থাৎ ছটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কে কোথায় ছিল সেটাও অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আচ্ছা ভিকার, ফোনটা কখন এসেছিল?

আমি বললাম, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হবে।

-কণ্ঠস্বরটা, নারী না পুরুষের?

–নারীকণ্ঠ বলেই মনে হয়েছে আমার। মিসেস অ্যাবোট বলেই ধারণা হল।

ফোন পেয়েই আপনি বেরিয়ে পড়লেন, না কিছুটা সময় নিয়েছিলেন?

সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। তবে বাইসাইকেল নিইনি।

–মিসেস অ্যাবোটের বাড়ি কতদূর?

–মাইল দুই হবে।

-ওদিকে যাবার সবচেয়ে সংক্ষেপ রাস্তাটা মনে হয় ওল্ডহল বনের মধ্য দিয়ে, আপনি সেই পথেই গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।

–না, সংক্ষিপ্ত হলেও ওটা চলাচলের উপযুক্ত নয়। আমি মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা রাস্তাটা ধরে গিয়েছি। ফিরেছিও ওই পথে।

–এই রাস্তাটাই তো ভিকারেজের উল্টো দিক থেকে এসেছে?

–হ্যাঁ।

–আপনার স্ত্রী তখন কোথায় ছিলেন?

–তিনি সকালেই লণ্ডনে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন ছটা পঞ্চাশের ট্রেনে।

–ঠিক আছে। ইনসপেক্টর কি যেন চিন্তা করলেন, পরে বললেন, এখন আমি পর পর কয়েকটা কাজ সারব। মেয়েটাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য একবার ভিকারেজে যেতে হবে।

সেখান থেকে যাব ওল্ডহল। তারপর যাব মিসেস লেসট্রেঞ্জের কাছে। খুনের আগের দিন এই মহিলা মিঃ প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। একটু খোঁজ খবর নিতে হবে।

ইতিমধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছিল। বিদায় জানিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

.

১৩.

বাড়ির পথে দেখা হয়ে গেল ডাঃ হেডকের সঙ্গে। তিনি গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁকে বেশ চিন্তিত বলে মনে হল। বললেন, আমার বাড়ি চলুন। অগত্যা উঠতে হল তার গাড়িতে। ডাঃ হেডকের বাড়িতে এসে সার্জারি ঘরে বসলাম। আমরা যে গুলি করার সঠিক সময়টা জানতে পেরেছি তা তাকে জানালাম।

কথায় কথায় ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারলাম, সহকারী পাদ্রী হস বেশ কিছুদিন থেকে এনকেফেলাইটিস লেথার্জিতে ভুগছে। ব্যাপারটা আমি জানতাম না। তাই ঠিক করলাম সময় করে তাকে একবার দেখতে যেতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

ঘরে গ্রীসলভা আর ডেনিস গল্প করছিল। ওরা সব ঘটনা জানতে চাইল। আমি সংক্ষেপে সবই বললাম।

একটু পরেই মেরী এসে একটা চিরকূট হাতে দিয়ে জানাল ক্লেমেট, হস দেখা করতে এসেছে। বসার ঘরে অপেক্ষা করছে। এটা পাঠিয়ে দিল আপনাকে।

চিরকূটের লেখাটা পড়লাম–

প্রিয় মিঃ ক্লেমেট,

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যদি একবার আমার ওখানে আস তাহলে বাধিত হব। ভীষণ বিপদে পড়েছি। তোমার পরামর্শ দরকার।

বিনীত

এসটেটেল লেসট্রেঞ্জ

একটু পরেই হসের কাছে এলাম। তার চোখ মুখে একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দেখে চমকে উঠলাম। হাতদুটোও কেমন কাঁপছিল। মনে হল অসুস্থ। ব্যস্ত হয়ে বললাম, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ? তাহলে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নাও।

হস আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, দরকার হবে না। আমি খুব ভালই আছি। শরীরের যা অবস্থা হয়েছে, কোনদিনই আর ভাল হয়ে উঠব বলে বিশ্বাস হয় না। এই অবস্থাতেই জীবন টেনে নিতে হবে।

একটু থেমে দম নিয়ে সে ফের বলতে লাগল, গ্রামে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এজন্য খুব মানসিক চাপ পড়ছে। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

-চাপ পড়াই স্বাভাবিক। বললাম আমি।

–ওরা কি মিঃ রেডিংকে গ্রেপ্তার করেনি?

–না। তার জবানবন্দি পুলিস মেনে নিতে পারেনি।

–তাহলে পুলিস বুঝতে পেরেছে মিঃ রেডিং সম্পূর্ণ নির্দোষ?

–হ্যাঁ সম্পূর্ণভাবে।

–তাহলে পুলিস কি অন্য কাউকে সন্দেহ করছে?

হস-এর কৌতূহল আমার মাত্রাতিরিক্ত মনে হল। কাজেই আমাকে সংযত হতে হল। বললাম, তা বলতে পারব না। তবে ইনসপেক্টর অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

হস নিজে থেকেই বলে চলল, এরকম একটা কাজ যে কে করল বুঝতে পারছি না। তবে মিঃ প্রথেরোর ব্যবহার তো মোটেই ভাল ছিল না। নিজেই লোককে শত্রু বানিয়ে ফেলত।

হতে পারে। বললাম আমি।

–কেন মিঃ ক্লেমেট, তোমার মনে নেই, আগের দিন সকালেই তো তোমাকে বলেছিল, আর্চার নামে লোকটা তাকে হুমকি দিয়েছে।

আমার মনে পড়ল কথাটা। মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

–আমি সেই সময় কাছেই ছিলাম। তুমি পুলিসকে কি আর্চারের কথাটা বলেছিলে? মানে ওই হুমকি দেবার ব্যাপারটা।

-না, বলিনি।

–তাহলে এবার পুলিসকে জানাও।

বললাম, তুমিও তো কথাগুলো শুনেছিলে, পুলিসকে বলা উচিত মনে হলে তুমি নিজেই তো সে কাজটা করতে পার।

একথা বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। হসকে বিদায় জানিয়ে মিসেস লেসট্রেঞ্জের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

আমার অপেক্ষাই করছিলেন ভদ্রমহিলা। চিঠি পেয়েই চলে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, কথাটা ভেবেছিলাম পরে বলব। কিন্তু সেটা ঠিক হত না।

–বেশ তো। আপনাকে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব।

–খুব একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি মিঃ ক্লেমেট। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে আপনি সৎ পরামর্শ দিন।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিসেস লেসট্রেঞ্জের মুখের দিকে তাকালাম।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝি এসে খবর দিল একজন পুলিস ইনসপেক্টর কি জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন। শুনে মিসেস লেসট্রেঞ্জ চোখ বুজলেন। মনে হল কয়েকবার সেঁক গিললেন। পরে ঝিকে বললেন, ওকে নিয়ে এসো।

–আপনিও বসুন মিঃ ক্লেমেট। বললেন আমাকে। একটু পরেই ইনসপেক্টর স্লাক ঘরে ঢুকে সুপ্রভাত জানালেন। আমার দিকেও তাকালেন। কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার উপস্থিতি তার অভিপ্রেত নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মিসেস লেসট্রেঞ্জ বললেন, ইনসপেক্টর, মিঃ ক্লেমেট এখানে থাকলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না আশাকরি।

-না, তেমন অসুবিধা নেই। তবে না থাকলেই ভাল হত।

ইনসপেক্টরের এই কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মিসেস লেসট্রেঞ্জ বললেন, বলুন, আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি।

–মিঃ প্রথেরোর খুনের তদন্তের দায়িত্ব আমার ওপরেই রয়েছে। সেই কারণেই নিয়ম অনুসারে কিছু কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যা ছটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কে কোথায় ছিল, সে ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে হচ্ছে।

মিসেস লেসট্রেঞ্জ বললেন, তার মানে আপনার জিজ্ঞাস্য হল, গতকাল সন্ধ্যাবেলা আমি কোথায় ছিলাম, তাই তো?

–হ্যাঁ তাই।

–সেই সময়টা আমি বাড়িতেই ছিলাম।

–ওহ, আপনার বাড়ির ঝিটাও নিশ্চয় সেই সময় বাড়িতেই ছিল?

–না গতকাল বিকেলে ও বাড়ি ছিল না।

–আচ্ছা।

মিসেস লেসট্রেঞ্জ বললেন, কাজেই বুঝতেই পারছেন, আমার কথাটাকেই সত্যি বলে। আপনাকে ধরে নিতে হবে।

ইনসপেক্টর স্লাক নড়েচড়ে বসে বললেন, তাহলে ধরুন কোন মহিলা, মানে মিস হার্টনেলের কথাই বলছি, তিনি যদি ছটার সময় এসে বেল বাজিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে ফিরে গিয়ে থাকেন, আপনি কি তার ভুল বলবেন?

–বুঝতে পেরেছি, মাথা নেড়ে বললেন মিসেস লেসট্রেঞ্জ, ওই মহিলা বড়ই বিরক্তিকর। তিনি যাবার আগে অনেকবার বেল বাজিয়েছিলেন, আমি সাড়া দিইনি।

–কিন্তু কেউ যদি বলে ওই সময়টায় আপনাকে বাইরে দেখেছে?

কারুরই তা দেখা সম্ভব নয়, কেননা আমি বাড়িতেই ছিলাম। বেশ জোর দিয়েই মিসেস. লেসট্রেঞ্জ বললেন।

–তাহলে শুনুন মিসেস, মিঃ প্রথেরো খুন হবার আগের দিন রাত্রে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, একথাও কি মিথ্যা বলতে চান?

-না। আমি সত্যিই গিয়েছিলাম।

–কি প্রয়োজনে গিয়েছিলেন, তা কি দয়া করে বলবেন?

-সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার ইনসপেক্টর, তা বলা সম্ভব না।

–কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিষয়টিকেই যে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।

–আমি নিরুপায়। তবে এটুকু আমি বলতে পারি, খুনের ঘটনার সঙ্গে এই বিষয়ের কোন যোগ নেই।

–সেটা আপনার পক্ষে বিচার করা শক্ত মিসেস লেসট্রেঞ্জ।

-বললাম তো ইনসপেক্টর, আমি নিরুপায়। দয়া করে একই কথা পুনরাবৃত্তি করতে আমাকে বলবেন না।

ইনসপেক্টরের চোখ চকচক করে উঠল। তিনি বেশ ক্রুদ্ধস্বরেই এবারে বললেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই যে কোন প্রকারেই হোক আমি বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই–তা আমাকে করতে হবে।

মিসেস লেসট্রেঞ্জ, আপনি নিজেই নিজেকে বিপদে জড়িয়ে ফেলছেন।

মিসেস লেসট্রেঞ্জ একথার কোনই উত্তর করলেন না। তিনি নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

-আপনি কি কর্নেল প্রথেরোর পূর্বপরিচিত? ইনসপেক্টর এবারে তাঁর জেরার ধরন পাল্টালেন।

-হ্যাঁ। তবে অনেক বছর তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না।

–তাহলে তো আপনি মিসেস প্রথেরোকে চিনতেন বোঝা যাচ্ছে।

–হ্যাঁ।

–আচ্ছা, মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?

-না। আমি কেবল মিঃ প্রথেরোর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলাম, অন্য কারোর সঙ্গে নয়।

–ওই বাড়িতে গেলেন অথচ মিঃ প্রথেরোর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না কেন?

–সেটা আমার নিজের ব্যাপার ইনসপেক্টর।

–তাহলে এর বেশি আপনি কিছু বলবেন না? ইনসপেক্টরকে হতাশ শোনাল। –না।

–বেশ, আমি উঠছি। যাবার আগে আবারো বলে যাছি মিসেস লেসট্রেঞ্জ, ইচ্ছে করেই আপনি নিজেকে বিপন্ন করে তুলছেন।

একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি, তবে এটুকু জানিয়ে যাচ্ছি, খুব শিগগিরই আমরা প্রকৃত সত্য জানতে পেরে যাব।

ইনসপেক্টর চলে যাবার পরে আমিও উঠলাম। পথে দরজার সামনেই দেখা হয়ে গেল ডাঃ হেডকের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনসপেক্টর স্লাককে বেরতে দেখলাম, তিনি কি মিসেস লেসট্রেঞ্জকে জেরা করতে এসেছিলেন?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে গ্রামের পথে দ্রুত এগিয়ে চললাম।

ইনসপেক্টর কোন উদ্দেশ্যেই সম্ভবত ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাঁকে ধরে ফেললাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ ক্লেমেট, ওই মহিলাটি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

বললাম, না, ইন্সপেক্টর।

-উনি কেন এখানে থাকতে এসেছেন, এ সম্পর্কে আপনাকে কিছুই বলেননি?

এবারেও আমাকে একই উত্তর দিতে হল।

-মহিলা খুবই প্যাঁচালো। ব্ল্যাকমেলের আভাস পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

আমি কোন উত্তর করলাম না। হাঁটতে হাঁটতে শুনে যেতে লাগলাম ইনসপেক্টরের কথা।

–আপনি কি সেরকমই ভাবছেন?

তা না হলে বলুন, কেনই বা একজন অমন সুসজ্জিত মহিলা এখানে থাকতে আসবেন আর কেনই বা তিনি মিস বা মিসেস প্রথেরোকে এড়িয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?

একটু থেমে আবার বললেন ইনসপেক্টর, সবটাই একসূত্রে বাঁধা। ব্ল্যাকমেল ভাবতে অসুবিধা কি? আর সেই জন্যই মিসেস লেসট্রেঞ্জের পক্ষে স্বীকার করার এত অসুবিধা।

কথা শেষ করে নীরবেই কয়েক কদম চললেন। পরে বললেন, ওল্ডহলের চাকরটার সঙ্গে কথা বললে হয়তো কিছু জানা যাবে। ওদের দুজনের কথাবার্তা তার পক্ষে শোনা অসম্ভব নয়। যদিও সে জোর দিয়েই একবার বলেছে যে ওদের কোন কথাবার্তা শোনেনি।

তবে সে জানিয়েছে মিসেস লেসট্রেঞ্জকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিল বলে নাকি মিঃ প্রথেরো তার ওপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন। এব্যাপারে চাকরটাও খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

–তাহলে তো আপনি অনেকদূরই এগিয়ে গেছেন দেখছি।

ইনসপেক্টর বললেন, লোকটাকে দিয়েই কাজ উদ্ধার হবে বলে মনে হচ্ছে। কেন না তারও ব্যক্তিগত রাগ রয়ে গেছে মনিবের ওপর। যাইহোক, ওই বাড়ির গাড়ির চালকের সঙ্গেও একবার কথা বলতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই আমরা ওল্ডহলে এসে পৌঁছলাম।

গাড়ি চালকের ছোকরা বয়েস। ইনসপেক্টরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। কথা জড়িয়ে যেতে লাগল মুখে।

ইনসপেক্টর স্লাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তুমি তোমার মালিককে গাড়ি চালিয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, স্যার।

–তখন কটা হবে?

সাড়ে পাঁচটা, মনে আছে।

–মিসেস প্রথেরেও সঙ্গে গিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ, স্যার।

রাস্তার মাঝখানে কোথাও গাড়ি থামিয়েছিলে?

–না স্যার।

–গ্রামে পৌঁছবার পরে কি করলে?

-কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আমাকে জানালেন গাড়ির আর দরকার নেই। মিসেস প্রথেরো কিছু কেনা কাটা করলেন। সেসব গাড়িতে রেখে আমাকে চলে আসতে বললেন।

মিসেস প্রথেরোকে গ্রামেই ছেড়ে দিয়েছিলে?

–হ্যাঁ স্যার।

–তখন কটা হবে?

সময়টা-সওয়া ছটা মত হবে।

–তাকে কোথায় ছেড়েছিলে?

–চার্চে।

মিসেস প্রথেরো কোথায় যাবেন সে সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

–না স্যার, সে সব কিছু বলেননি।

এমন সময় লেটিস এসে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি বার করতে, সে একটু বেরুবে।

ইনসপেক্টর লেটিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

লেটিস বিরক্ত হল তা স্পষ্টতই বোঝা গেল। বলল, আমি কোন কাজেরই সময়ের হিসেব রাখি না।

–তবুও আমার ধারণা গতকাল লাঞ্চের পরেই তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে?

লেটিস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

–কোথায় তুমি গিয়েছিলে জানাতে আপত্তি আছে?

–মোটেই না। টেনিস খেলতে গিয়েছিলাম।

–সঙ্গে আর কে ছিল?

–হার্টলি লেপিয়ারস। বেলহামে ম্যাচ ছিল।

–কখন ফিরেছিলে?

–সময় জানি না। সময়-টময়ের হিসেব রাখা আমার পোষায় না।

–আমার মনে হয় তুমি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ফিরেছিলে।

–হ্যাঁ, তাই হবে।

লেটিসকে বিদায় দিয়ে ইনসপেক্টর জানালেন, এবারে ঝি-টার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করব বলে চাকরকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠালাম। চাকর ফিরে এসে জানাল, তিনি আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

একটু পরেই নিচে নেমে এলেন মিসেস প্রথেরো। বসতে বসতে বললেন, আবার কিছু হয়েছে নাকি?

আমি মাথা নাড়লাম। বললেন, ডাক্তার খুবই চমৎকার মানুষ। আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। আচ্ছা মিঃ ক্লেমেট, একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। গুলির শব্দটা আমার কানে এলো না কেন?

–শব্দটা হয়তো পরে হয়ে থাকবে।

–কিন্তু চিরকূটটায় যে সময় লেখা ছিল ছটা কুড়ি।

আমি বললাম, সম্ভবত ওটা খুনীর হাতের লেখা।

মিসেস প্রথেরোর মুখ কেমন বিবর্ণ দেখালো। বললেন, কি সাংঘাতিক।

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে আমি বিদায় নিলাম। ওল্ডহল থেকে বেরিয়ে আমি একটা অব্যবহৃত পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

এদিকে জঙ্গল বেশ ঘন। কিছুটা যেতেই হঠাৎ মনে হল, কেউ যেন আসছে। একটু পরেই লরেন্স রেডিংকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হাতে একটা বড় পাথরের টুকরো।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লরেন্স পাথরটা তুলে ধরে বলল, এটা একটা উপহার মিঃ ক্লেমেট; কোন ক্লু নয়।

জিজ্ঞেস করলাম কার জন্য উপহার?

–মিস মারপলের জন্য। কথা বলার আগে এটা দিয়ে তাকে খুশি করব। তার জাপানী বাগানের জন্য এটা খুব পছন্দ হবে, কি বলেন?

আমি হেসে বললাম, তা হবে।

–আমার ধারণা, গতকাল সন্ধ্যাবেলা কিছু যদি কেউ দেখে থাকে তবে সে মিস মারপল। অন্তত তার কাছ থেকে ক্লু উদ্ধার হতে পারে। সেসব হয়তো উনি পুলিসকে বলা প্রয়োজন মনে করেননি।

-হ্যাঁ, তা অসম্ভব নয়। আমি বললাম।

–মিঃ ক্লেমেট, এই ঘটনাটার শেষ অবধি আমি দেখতে চাই, অন্তত অ্যানার কথা ভেবে এই কাজটা আমি করব। ইনসপেক্টর স্লাকের ওপর আমার বিশেষ ভরসা নেই।

-তার মানে, তুমিও এখন গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে?

একটু হাসল লরেন্স। তারপর বলল, আপনি এ সময়ে এই জঙ্গলে কেন?

একটু থেমে পরে বলল, আমি জানি আপনি কিসের সন্ধান করছেন, ওই একই উদ্দেশ্য আমারও। খুনীকে আমার পড়ার ঘরে ঢুকতে হলে প্রথম রাস্তা হল পেছনের রাস্তা দিয়ে গেট পেরিয়ে। দ্বিতীয় রাস্তাটা হল সদর দরজা। তৃতীয় কোন রাস্তা আছে কিনা সেই সন্ধানই আমি এখন করছি।

ভিকারেজের দেয়ালের পাশের ঝোঁপগুলো দেখলেই বোঝা যাবে খুনী দেয়াল টপকে ছিল কিনা।

বললাম, ওটা আমিও চিন্তা করেছি।

-ওদিকটা দেখার আগে মিস মারপলের কাছে যাচ্ছি। তাকে জিগ্যেস করে দেখি গতকাল সন্ধ্যার সময় পেছনের রাস্তা দিয়ে উনি কাউকে যেতে দেখেছেন কিনা। বিশেষ করে আমি আর মিসেস প্রথেরো যখন স্টুডিও ঘরে ছিলাম।

দুজনে মিলে মিস মারপলের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বাগানেই তিনি কাজ করছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকলেন। লরেন্স তাকে পাথরের টুকরোটা দিল। খুবই খুশি হলেন তিনি।

দু-চার কথার পর লরেন্স জানতে চাইল কাল মিস মারপল পেছনের রাস্তা দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেখেছেন কিনা।

মিস মারপল বললেন, না তো, কাউকে চোখে পড়েনি।

–কিংবা ওই সময় বনের রাস্তায় কাউকে যেতে দেখেছেন?

-তা দেখেছি। অনেকেই তো যাতায়াত করেছে। ডঃ স্টোন যেখানে খননের কাজটা করছেন, বনের পথেই সেখানে যাওয়া সবচেয়ে সহজ রাস্তা। ডঃ স্টোন আর মিস স্লাককে যেতে দেখেছি। পরে ডঃ যখন ফিরে আসছিলেন তখনই তো মিসেস প্রথেরো আর আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

–আচ্ছা, মিস মারপল, আমি বললাম, যে গুলির শব্দটা আপনি শুনেছিলেন, তাহলে মিসেস প্রথেরো আর লরেন্সও নিশ্চয় সেটা শুনে থাকবে?

লরেন্স আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকালো। পরে বলল, হ্যাঁ কয়েকটা শব্দ শুনেছি।

মিস মারপল বললেন, আমি মাত্র একটা শব্দই শুনেছি। ইনসপেক্টর স্লাকও এই কথা জানতে চেয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ছে লরেন্স আর মিসেস প্রথেরো স্টুডিও ছেড়ে চলে যাবার পরেই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম।

লরেন্স বলল, শব্দটা এমন কিছু কানে পড়বার মত ছিল না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমরা যখন স্টুডিওতে তখনই শব্দটা হয়েছিল। তবে অ্যানাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখব।

কথাটা শুনে মিস মারপল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

লরেন্স বলে চলেছে, একটা বিষয় কিন্তু আমার কাছে খুবই রহস্যজনক ঠেকছে। বুধবার রাতে মিঃ প্রথেরোর ডিনারের পর মিসেস লেসট্রেঞ্জ কেন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মিঃ প্রথেরো কিন্তু এই ব্যাপারটা বাড়িতে তার স্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে বলেননি।

মিস মারপল বললেন, এই কথাটা মিঃ ক্লেমেট জানলেও জানতে পারে।

কথা শুনে আমার সন্দেহ হল, সেদিন সন্ধ্যাবেলা যে মিসেস লেসট্রেঞ্জের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তা মিস মারপলের নজর এড়ায়নি।

মিস মারপল এরপর জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে ইনসপেক্টর স্লাক এখন কি ভাবছে?

আমি বললাম, ভদ্রলোক এখন ওল্ডহলের চাকরটাকে নিয়ে পড়েছেন। তবে মনে হচ্ছে লাভ কিছু হবে না।

মিস মারপল বললেন, আমার ধারণা ওদের দুজনের কথাবার্তা তৃতীয় কেউ শুনে থাকবে। অর্থাৎ ওরকমটা কেউ সর্বদাই করে থাকে। লরেন্স কিছু বলতে পারছেন না?

লরেন্স বলল, মিসেস প্রথেরো কিছুই জানে না, আমি ভাল করেই জানি।

-না না, আমি ঝি-চাকরগুলোর কথাই বলছি। ওরা পুলিসের কাছে মুখ খুলতে চায় না। আমার মনে হয়, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো।

–বলছেন? তাহলে আজ সন্ধ্যাবেলাতেই একবার চেষ্টা করব।

এরপর মিস মারপলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লরেন্স আর আমি ফের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম।

জঙ্গলের পথ ধরে কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় এলোমেলো ঝোপঝাড় দেখে মনে হল, তখন থেকেই কেউ রাস্তা ছেড়ে নেমেছে।

লরেন্স বলল, একটু আগে এই চিহ্নটা দেখেই আমি বনের ভেতরে ঢুকেছিলাম। কিন্তু ভেতরে ঢোকা হয়নি।

ঝোপঝাড় সরিয়ে সেদিক দিয়ে আমরা খানিকটা এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই, কেউ যে এ পথে গেছে তার চিহ্ন স্পষ্ট।

ঝোপঝাড়ের দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থাটা ভিকারেজের দেয়ালের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে।

দেয়ালটা বেশ উঁচু, মাথায় ভাঙা বোতলের টুকরো বসানো রয়েছে। চেষ্টা করলে দড়ির মই দিয়ে দেওয়াল টপকানো অসম্ভব হবে না।

আমরা দেয়ালটার কাছাকাছি হতেই একটা শব্দ কানে এল। সামনের দিকে তাকালাম। তখনই চোখ পড়ল ইনসপেক্টর স্লাকের ওপরে। কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এদিকে কি করছেন? আমি তাকে আমাদের উদ্যমের কথাটা জানালাম শুনে তিনি বললেন, যেই খুন করে থাকুক না

কেন, এই পথ দিয়ে সে আসেনি। আমিও দেখেছি, সে রকম কোন চিহ্ন দেয়ালের কোন পাশে নেই। খুনী এসেছে সদর দরজা দিয়েই।

আমি বললাম, সেটা অসম্ভব ইনসপেক্টর।

-অসম্ভব কেন? সদর গেট তো সবসময়ই ভোলা থাকে আপনার। যে কেউই ইচ্ছে করলে ভেতরে ঢুকতে পারে।

রান্না ঘর থেকে তাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেকেই জানতো আপনারা কেউ বাড়িতে নেই।

ভিকারেজের গেটের উল্টোদিকের রাস্তাটা ধরে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ইচ্ছেমত বেরিয়ে ভিকারেজে ঢোকা যায়। খুনী সেই কাজটাই করেছে।

–দেয়াল টপকেও তো ঢোকা সম্ভব। একটা দড়ির মই হলেই যথেষ্ট। বলল লরেন্স।

-না, সেটা ঝুঁকির হয়ে যেত। দেওয়াল টপকালে মিসেস প্রাইস রিডলের বাড়ির ওপরতলা থেকে চোখে পড়ে যাওয়া সম্ভব।

.

১৪.

ইনসপেক্টর স্লাক এলেন পরদিন সকালেই। জানালেন, দুটো চোরা ফোনেরই খোঁজ পেয়ে গেছি মিঃ ক্লেমেট।

আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, আমার পাওয়া ফোনটার কথা।

ইনসপেক্টর বললেন, আপনি যে ফোনটা পেয়েছিলেন সেটা করা হয়েছিল ওল্ডহলের নর্থলজ থেকে। এখন ওটা ফাঁকা। পুরনো বাসিন্দারা চলে গেছে। নতুন বাসিন্দা এখনো এসে পৌঁছয়নি। লজের একটা জানালা খোলা ছিল। তবে সেখানে কোন রকম আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।

–দ্বিতীয় ফোনটা–মিসেস প্রাইস রেডলি

–ইনসপেক্টর রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, খোঁজ নিয়ে জেনেছি সেটা করা হয়েছিল লরেন্স রেডিং-এর বাড়ি থেকে।

–সেকি। ভারি অদ্ভুত কাণ্ড!

–হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে। রেডিং সেই সময় বাড়ি ছিল না। ডঃ স্টোনের সঙ্গে যখন সে ব্লুবারে যায় সেই সময়েই, ছটা তিরিশ নাগাদ, ফোনটা ওর ঘর থেকে করা হয়েছিল। রেডিং-এর ঘর ফাঁকা, এটা কোন লোক জানতো। তার ওপরে বাইরে যাবার সময় দরজায় তালা দেবার অভ্যাস তার ছিল না। সেই সুযোগেই কাণ্ডটা হয়েছে।

–ঠিকই বলছেন। আমি চিন্তিতভাবে বললাম।

–একই দিনে দুটো ফোন–অদৃশ্য একটা যোগাযোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি? আমার দৃঢ় ধারণা দুটো ফোন একই লোক করেছে।

–কিন্তু উদ্দেশ্য কি?

–সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা, মিঃ প্রথেরো খুনের আগের সময়টায় মিসেস লেসট্রেঞ্জ কি করছিল, কখনো ভেবে দেখেছেন?

মিসেস লেসট্রেঞ্জ!

হ্যাঁ, আমার ধারণা ওই ভদ্রমহিলা মিঃ প্রথেরোকে ব্ল্যাকমেল করত।

আমি হেসে বললাম, মনে হচ্ছে এটা ঠিক ভাবনা নয়। কেননা যে হাঁস সোনার ডিম প্রসব করে, কোন বুদ্ধিমান সেটাকে মেরে ফেলতে চাইবে না।

ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ইনসপেক্টর স্লাক বললেন, এমন তো হতে পারে, অতীতে মহিলা ব্ল্যাকমেল করতেন, মাঝখানে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। তারপর মিঃ প্রথেরোর খোঁজ। পেয়ে এখানে চলে এসেছেন। এবং যথারীতি ব্ল্যাকমেল শুরু করেন।

–বেশ, বলে যান। বললাম আমি, তারপর কি হল?

-ততদিনে দিনকাল আর আগের মত ছিল না। নতুন করে ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করতে মিঃ প্রথেরো হয়তো সাফ-সুফ জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পুলিসের সাহায্য নেবেন। সুতরাং নিজেকে বাঁচাবার সহজ পথটাই মহিলাকে বেছে নিতে হয়েছিল।

ইনসপেক্টরের যুক্তিগুলো খুবই জোলো মনে হল আমার। তাছাড়া মিসেস লেসট্রেঞ্জকে যেমন দেখেছি, তার সঙ্গে ইনসপেক্টরের কথাগুলো মেলাতে পারলাম না।

আরও দু-চার কথার পরে ইনসপেক্টর চলে গেলেন।

কি মনে হলো, ঘর থেকে বেরিয়ে লরেন্সের বাড়ির দিকে এগুলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে ও আমাকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেল।

–তুমি কি ওল্ডহলে ঝিটার সঙ্গে কথা বলেছিলে? আমি জানতে চাইলাম।

–হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। মুখ খোলাতে অনেক কষ্ট হয়েছে।

–কিছু জানতে পেরেছ?

-বলছি আপনাকে। মিঃ প্রথেরো আর মিসেস লেসট্রেঞ্জ যখন ঘরে বসে কথা বলছিলেন, সেই সময় ওই বাড়ির রাঁধুনী তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে ফিরছিল। সেই সময় মিঃ প্রথেরোকে বেশ চড়া গলায় কথা বলতে শুনতে পায়।

ঝি আমাকে রাঁধুনীর কাছে নিয়ে যায়। রাঁধুনী বলল, মনিব খুব চড়া গলায় কথা বলছিলেন। মহিলাকে বলছেন, তাছাড়া তোমাকে তো আমি বারবারই বারণ করেছি। মহিলাটি কি বললেন বোঝা গেল না। তবে মনে হল মনিবকে দিয়ে তিনি কিছু করাতে চাইছিলেন। মনিব রাজি হচ্ছিলেন না।

পরে বলতে শুনলাম, তুমি এখানে এসে খুব অন্যায় করেছ। তারপর কয়েকটা কথা কি বললেন বুঝতে পারিনি, পরে কানে এলো, তুমি ওর দেখা পাবে না। আমি নিষেধ করেছি। শুনে আমার মনে হল মহিলাটি মিস প্রথেরোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কিন্তু মনিব রাজি হচ্ছেন না।

রাঁধুনি পরে বলল, সে মিঃ প্রথেরোকে একবার বলতে শুনেছে, আমি এ বিশ্বাস করি না।–ডঃ হেডক যাই বলুন না কেন।

মিসেস লেসট্রেঞ্জ সম্ভবত উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে তিনি নাকি বলেছেন, আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। মনে রেখো। কাল তোমাকে ঠিক মরতে হবে–মরতে হবে। এরপরই তিনি চলে যান।

লরেন্স থামল। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নিশ্চুপ বসে রইলাম। আমি ভাবলাম, এটা বোঝা যাচ্ছে যে দুজনের সম্পর্কটা কোন ভাবেই মধুর নয়।

আর তাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টা এমনই নিষিদ্ধ যে মিঃ প্রথেরো সেটা মিসেস প্রথেরোকে জানতে দিতে চাননি। ডাক্তার হেডক যে তার প্রতি সহানুভূতিশীল তাও বোঝা যাচ্ছে। তবে মিসেস লেসট্রেঞ্জ যে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা কিছুতেই ভাবতে পারছি না।

বাড়িতে ফিরেই দেখি তুলকালাম কাণ্ড! গ্রীসলডা, ডেনিস, মেরী তিনজনই একজায়গায়। সবারই মুখ থমথমে।

জানা গেল, লেটিস এসেছিল। সে নাকি একটা কানের দুল খুঁজে পাচ্ছে না। এখানেও খুঁজেছে, সকলকে জিজ্ঞেস করেছে। মেরীকে নাকি অহেতুক চোটপাট করেছে। তাতেই মেরীর গোসা হয়েছে, বাইরের লোক কেন তার ওপর চোখ রাঙাবে।

যথারীতি আমাকে মেরীর মান ভাঙাতে কিছু কথা বলতে হল। ডেনিস বলল, লেটিস বড় অন্যমনস্ক মেয়ে কাকা। কোথায় কখন কি রাখে তা নিজেই জানে না। সবাইকে উদ্রব্যস্ত করে মারে। আমি নিশ্চিত, ও এখানে কোন কানের দুল ফেলে যায়নি। বৃহস্পতিবার সেটা পরে ও খেলতে গিয়েছিল দেখেছিলাম।

-ওখানেই হারিয়েছে। আমি বললাম।

এরপর পড়ার ঘরে চলে এলাম। এখানে কি কিছু ফেলে গেল লেটিস? চারদিকটা তাকিয়ে দেখলাম।

লেখার টেবিলটার দিকে তাকালাম। ওটার ওপরেই কয়েকদিন আগে মিঃ প্রথেরো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল।

টেবিলটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনার সময়েই হঠাৎ তলার দিকে মেঝেয় চোখ আটকে গেল। ছোট মত কি একটা চকচক করছে। সরে গিয়ে নিচু হয়ে সেটা তুলে নিলাম।

.

১৫.

পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলেই মিসেস প্রথেরোর একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে গ্রীসলডাকে। ওর চিঠিটা আমিও পড়লাম।

প্রিয় গ্রীসলডা,
তুমি আর ভিকার যদি আজ মধ্যাহ্নভোজটা এখানে সারো তাহলে খুব খুশি হব। আমার এখানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে। সে কারণেই ভিকারের পরামর্শ দরকার। আমি কাউকেই এসব বলিনি। তোমরাও এখন এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলল না।
তোমার স্নেহের অ্যানা প্রথেরো

চিঠিটা পড়া শেষ করে আমি চিন্তিতভাবে তাকে বললাম, কি এমন ঘটতে পারে নতুন করে বুঝতে তো পারছি না।

গ্রীসলডা বলল, আমিও তো তাই ভাবছি। বেচারীর জন্য বড় কষ্ট হয়। খুনের ব্যাপারটা কিছু কি এগুলো?

-মনে হয় আমরা ঘটনার শেষ প্রান্তে এসে এখনো পৌঁছতে পারিনি। ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে সবকিছু।

–তুমি একথা বলছো কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে?

-না, তা নয়। এমন জটিল আবর্ত যে সেগুলো ভেদ করতে না পারলে এ কেসের সমাধান সম্ভব নয়। যাই হোক, চল ওল্ডহল থেকে তাহলে ঘুরে আসা যাক।

–হ্যাঁ যাব। তুমি আর কোথাও বেরিয়ো না।

.

খাওয়া দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে মিসেস প্রথেরো বলল, মিঃ ক্লেমেট, আপনাকে আমি গুটিকতক কথা বলতে চাই। ওপরে বসার ঘরে যাই চলুন।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে ছাদে চলে এলাম। সেখানে মই-এর মত একটা সিঁড়ি ওপরতলায় উঠে গেছে। আমরা সেটা বেয়ে উঠে গেলাম। একটা ময়লা চিলেকোঠার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

মিসেস প্রথেরো ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। চারপাশে নানান বাতিল অদ্ভুত জিনিস জড়ো করা।

মিসেস প্রথেরো বললেন, এখানে নিয়ে এলাম বলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হচ্ছেন। খুলে বলছি শুনুন। কাল শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই মনে হল কেউ বাইরে চলাফেরা করছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

এরপর শব্দটা কিসের দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলাম। বুঝতে পারলাম, ওপরের ওই ঘরটা থেকে শব্দটা আসছে। আমি নিঃশব্দে সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালাম।

শব্দটা আবার উঠতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কে?

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থেমে গেল। সাড়াও পেলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, হয়তো আমারই ভুল। মনের অবস্থা তো ঠিক নেই। কি শুনতে কি শুনেছি। আমি ফিরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তারপর?

–আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই এই ঘরে চলে এলাম। আর এটা দেখতে পেলাম। কথাটা বলে মিসেস প্রথেরো উবু হয়ে দেয়ালে উল্টো করে ঠেস দেওয়া একটা ছবি ঘুরিয়ে ধরল।

দেখলাম একটা তৈলচিত্র। কিন্তু ছবির অবস্থা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। সূক্ষ্ম কিছু দিয়ে এমন ভাবে ছবির ওপরটা ফালা ফালা করে আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে যে ছবিটা কার তা চেনা যাচ্ছে না।

–এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল। এটা আঁচড়ানোর শব্দই আমি পেয়েছিলাম। ব্যাপারটা কিছু ধরতে পারছেন?

আমি বললাম, দেখে মনে হচ্ছে কেউ মনের ঝাল মিটিয়েছে। এভাবে ফালাফালা করার মধ্যে একটা আক্রোশ ফুটে উঠছে।

–এটা আমিও ভেবেছি।

–প্রতিকৃতিটা কিসের তা বুঝতে পারছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

–এটাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ে হয়ে আমার এখানে আসার আগে থেকেই এ ঘরে জিনিসপত্রগুলো ছিল। কিন্তু কোনদিন ঘরে ঢুকে এসব দেখার ইচ্ছে হয়নি।

.

আমি চিত্রটা খুঁটিয়ে দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। বললাম, এমনভাবে আঁচড় কাটা হয়েছে যে কিছুই উদ্ধার করা যাচ্ছে না।

–এই ব্যাপারটাতে আমি খুবই ভীত হয়ে পড়েছি। কি করব বুঝতে পারছি না।

ছবিটা আর দেখার কিছু ছিল না। আমরা দুজনে নিচে বসার ঘরে চলে এলাম।

সোফায় বসতে বসতে মিসেস প্রথেরো বললেন, কি বলেন, পুলিসে খবর দেব?

আমি চিন্তিত ভাবে বললাম, ব্যাপারটার সঙ্গে খুনের ঘটনার কোন যোগসূত্র আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। না ভেবে কিছু করাটা কি ঠিক হবে?

–তা অবশ্য ঠিক।

–আপনি কি ভাবছেন?

-দেখুন, আর মাস ছয়েক আমি এখানে থাকব। দুর্ঘটনাটা না ঘটলে অবশ্য আরও আগেই চলে যেতাম। এখন গেলে লোকে অন্যরকম কথা রটনা করবে। ছমাস কাটার পরে আমি লরেন্সকে বিয়ে করছি।

কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও বলে চলল, আপনি তো বুঝতে পারছেন, আসল খুনী যতক্ষণ ধরা না পড়ছে ততক্ষণ লোকে ভাববে লরেন্সই খুনটা করেছে। বিশেষ করে আমাকে যখন ও বিয়ে করবে।

–কিন্তু পুলিস তো জানিয়েছে, লরেন্স সন্দেহমুক্ত। এতে এটা পরিষ্কার যে লরেন্স খুন করেনি।

মিসেস প্রথেরো বললেন, কিন্তু লোকে এসব বুঝবে না। আমি সে জন্যেই এখানে থেকে গেলাম। শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে চাই। মিস ক্র্যামকে আমার এখানে ছুটি কাটিয়ে যেতে এজন্যই নিয়ে এলাম।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ওই মহিলাকে ওর সঙ্গে জড়িত মনে করছেন?

-না সেরকম ভাবছি না। তবে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে কিছু জানে। কাছে থেকে একটু বুঝতে চাইছি।

আমি বললাম, একটা ব্যাপার খুবই লক্ষণীয় মনে হচ্ছে, মিস ক্র্যাম যেদিন আপনার এখানে এলো, সেদিন রাতেই ওই ছবিটার ওপর আক্রমণ হল। তাই না?

-না, ওই এটা করেছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। কেন করবে? না, একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

–অসম্ভব তো অনেককিছুই মিসেস। আপনার এটাও কি অসম্ভব নয়?

–আমি তা জানি, ভিকার। আপনার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারি। সবসময় সবকথা বলে উঠতে পারি না।

কথার মাঝখানেই আমি একসময় পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট কানের দুলটা বার করে আনলাম। হাতের তেলোতে নিয়ে মিসেস প্রথেরোর সামনে ধরে বললাম, দেখুন তো, এটা আপনার কিনা?

একপলক দুলটার দিকে তাকিয়ে মিসেস প্রথেরো মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, ওটা কোথায় পেয়েছেন?

ওর সেকথার জবাব না দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওটা এখন দিন কয়েক আমার কাছে থাকলে আপনার আপত্তি নেই তো?

–না, থাক না।

মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে কথা শেষ করে আমি লেটিসের ঘরে গেলাম। ওকেও একই ভাবে দুলটা দেখালাম। বললাম, চিনতে পারছো? এটা আমার পড়ার ঘরে ফেলে রেখে এসেছিলে কেন?

প্রথমে ও অস্বীকার করল। পীড়াপীড়ি করলে স্বীকার করল যে সে ইচ্ছে করেই করেছে। অ্যানা প্রথেরো যাতে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এই উদ্দেশ্যেই করেছিল।

বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লেটিস।

গ্রীসলডাকে একাই ভিকারেজে পাঠিয়ে দিলাম। আমি একবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আজ আবার জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলাম।

সেদিনের পথ ধরে এগিয়ে চলতে চলতে বুঝতে পারলাম আমার আর লরেন্সের পরে আরো কেউ জঙ্গলে ঢুকেছিল। নতুন কিছু ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দুমড়ে আছে দেখা গেল।

আরো খানিকটা পথ ধরে এগুলাম। হঠাৎ মাটির দিকে চোখ পড়তে উবু হয়ে বসলাম। দু হাত দিয়ে ঘাস-পাতা সরাতেই একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়ল। জিনিসটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর ভিকারেজে ফিরে এলাম।

.

ভিকারেজে এসে দেখি হস আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ওর খুব কৌতূহল দেখলাম। সেসব জানার জন্যই বসে আছে।

তার অহেতুক কৌতূহল আমাকে বিরক্ত করে তুলল। দু-চার কথার পরে তাকে বিদেয় করলাম।

হল ঘরের টেবিলে দেখলাম গোটা চারেক চিঠি পড়ে আছে। প্রথম তিনটে লিখেছেন, মিসেস প্রাইস রিডলে, মিসেস ওয়েদারবাই আর মিস হার্টনেল। তিনজনই অনুরোধ করে লিখেছে, আমি গেলে কিছু জরুরী কথা জানাবে।

চতুর্থ চিঠিটা গ্রীসলডার নামে। সেটা আমি ওকে দিয়ে দিলাম।

৪. তিন মহিলার চিঠি

১৬.

ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম। তারপর তিন মহিলার চিঠি পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম না, এমন কি জরুরী ব্যাপার তিন মহিলাই একই সঙ্গে জানতে পারল?

একে একে তিনজনের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। কিন্তু কারুর কথাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বোধ হল না।

মিস হার্টনেল বলল, মিঃ প্রথেরো খুন হবার দিন মিসেস লেসট্রেঞ্জ বাড়িতে ছিল না। যদিও পুলিসকে তিনি উল্টো কথাই বলেছেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, সে এটা জানল কি করে? বলল, সেদিন বারবার বেল বাজিয়ে সাড়া না পেয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে পরপর দরজা উঁকি দিয়ে দেখেছে। কাউকেই দেখতে পায়নি।

মিস ওয়েদারবাই, পুরো নাম না বলে কেবল এল অক্ষর উল্লেখ করে জানিয়েছে ওই নামের মহিলাকে খুনের ঘটনার সময় ভিকারেজের আশপাশে দেখতে পেয়েছে।

মিসেস প্রাইস রিডলের কথা একেবারেই হাস্যকর। ওর ঝি নাকি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভিকারেজের কোন একটা ঘর থেকে হাঁচির শব্দ শুনতে পেয়েছে।

বিরক্ত হলেও প্রকাশ করলাম না। প্রার্থনার সময় এগিয়ে আসছিল দেখে উঠে পড়লাম। পথে নামতেই ডঃ হেডকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ..

এগিয়ে গিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। হস-এর মানসিক অবস্থা যা দেখছি, আমার মনে হয়, কিছুদিন তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া কিংবা হাওয়া বদলের জন্য বাইরে যাওয়া দরকার।

আমার কথা শুনে ডঃ হেডক চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। পরে বললেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। অনেক সময়ই ওর ব্যবহার কথাবার্তা বড্ড বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তবু তার জন্য দুঃখবোধ না করে পারি না।

একটু চুপ করে পরে আবার বললেন, প্রথেরোর জন্যও দুঃখ হয়। অন্য অনেকের মতই তাকে আমিও পছন্দ করতাম না। বেচারা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে আপনি আগে থেকে চিনতেন নাকি?

-হ্যাঁ। আমি যখন ওয়েসল্যাণ্ডে প্র্যাকটিস করতাম তখন সে ওখানেই থাকতো। সে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। যাক সে কথা, এদিকের খবরাখবর কতদূর?

আমি ডাক্তারকে তিন মহিলার কথা সংক্ষেপে জানালাম। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মিসেস লেসট্রেঞ্জ আমার বাড়িতেই এসেছিল। ওকে বিদায় জানাবার পরই আপনার বাড়ি থেকে মেরী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। কার সঙ্গে দেখা করবে বলে ও তড়িঘড়ি উঠে চলে গিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় দেখা করবার কথা বলেছিল, নিজের বাড়িতে কি?

-না, সেসব কিছু বলেনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। জঙ্গলের ভেতরে খুঁজে পাওয়া বাদামী রঙের ক্রিস্টালটা বের করলাম। ডাক্তারকে দেখিয়ে বললাম, এই জিনিসটা কি বলুন তো?

ডাক্তার দেখলেন জিনিসটাকে। মুখে হুম শব্দ করলেন। পরে বললেন, এটা পেলেন কোথায়? মনে হচ্ছে পিকরিক অ্যাসিড।

–জিনিসটা কি?

–একটা বিস্ফোরক।

–তা জানি। কিন্তু অন্য আর কি কাজে লাগে?

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, অনেক কাজেই লাগে। আগুনের সলিউশন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পেলেন কোথায়?

আমি হেসে বললাম, ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে একটা অদ্ভুত জায়গা থেকে তা বলতে পারি।

.

১৭.

আমাদের রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে মিস মারপল এলেন। একটা চেয়ার দখল করে–বললেন, খুনের রহস্যটার সমাধানের জন্য আমাদের সকলেরই সহযোগিতা করা উচিত। কয়েকটা ব্যাপার মাথায় এসেছে সেগুলো বলতেই চলে এলাম।

ঘরে গ্রিসলডা আর ডেনিসও ছিল। ওরা আমাদের ঘিরে বসল। ব্যাপারটা নিয়ে ওরাও খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

মিস মারপল একসময় বললেন, মিঃ ক্লেমেট, আপনার নিশ্চয়ই অবাক লাগছে, এরকম একটা ঘটনার ব্যাপারে আমি উৎসাহিত হলাম কেন ভেবে।

আমি হেসে বললাম, খানিকটা বেখাপ্পা যে লাগছে না তা নয়। কিন্তু...

–দেখুন, সব মানুষেরই কিছু একটা হবি থাকে। যেমন কেউ উল বোনে, কারুর সমাজসেবামূলক কাজ, এমনি আরো কত। আমার হবিটা মানব প্রকৃতি বিষয়ে। একটু অদ্ভুত সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টা এমনই যে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

মিস মারপল সবার দিকেই একপলক তাকিয়ে নিলেন। পরে বললেন, যা হোক, এবারে আসল কথায় আসি। খুনের ঘটনাটা ক্রমশই এমন ভাবে জট পাকিয়ে উঠেছে যে, সবাই মিলে চেষ্টা না করলে শেষ পর্যন্ত এর তলায় পৌঁছনো যাবে না।

–কথাটা ঠিক বলেছেন। আমি বললাম, কিন্তু যা দেখছি, মনে হচ্ছে, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গোপন করে যাচ্ছি। ওটাই আশ্চর্য ঠেকছে আমার কাছে।

এরপর আমি তাকে তিন মহিলার কাছ থেকে ঘুরে আসার কথাটা বললাম।

তাছাড়াও মিসেস প্রথেরোর চিলেকোঠার ছবি আবিষ্কারের কথা, আর ডাক্তার হেডক যে কুড়িয়ে পাওয়া ক্রিস্টালটাকে পিকরিক অ্যাসিড বলেছেন সব কথাই তাকে খুলে জানালাম।

মনোযোগ সহকারে সবকথাই শুনলেন মিস মারপল। পরে বললেন, এর প্রত্যেকটা ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে খুনের ঘটনার সত্য উদঘাটনে ওগুলো থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

আমি জিগ্যেস করলাম, পিকরিক অ্যাসিডের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। ওটা ওই জঙ্গলের ভেতরে এল কি করে?

মিস মারপল গ্রিসলডার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একটা গোয়েন্দা উপন্যাসে পড়েছিলাম, একটা লোককে ওই অ্যাসিড খাইয়ে মারা হয়েছিল।

–কিন্তু এখানে তো বিষ খাওয়ানোর কোন ঘটনা ঘটেনি।

এরপর খুনের ঘটনা সম্পর্কে আমি যে ছকটা করে রেখেছিলাম, সেটা মিস মারপলের হাতে তুলে দিলাম। বললাম, দেখুন তো চোখ বুলিয়ে, কোন পয়েন্ট বাদ পড়ল কিনা।

আমার ছকটা এই রকম–

বৃহস্পতিবার–কর্নেল প্রথেরোর সঙ্গে আমার কথা বলার সময় সকাল ১২-৩০ থেকে সন্ধ্যা ছটা থেকে ছটা পনেরোতে পরিবর্তন করে।

১২-৪৫ মিঃ–পিস্তলটা যথারীতি বুক সেলফের ওপরেই দেখা গেছে।

৫-৫০ মিঃ-কর্নেল প্রথেরো এবং অ্যানা প্রথেরো গাড়ি করে গ্রামে যান।

৫-৩০-ওল্ডহলের নর্থলজ থেকে আমার কাছে একটা চোরাফোন আসে।

৬-১৫ (দু-এক মিনিট আগে হতে পারে) কর্নেল ভিকারেজে পৌঁছান। আমি ছিলাম না বলে মেরী তাকে পড়ার ঘরে নিয়ে বসায়।

৬-২০ মিঃ–মিসেস প্রথেরোকে পেছনের রাস্তা ধরে একলা ফিরতে দেখা যায়। এরপর বাগান পার হয়ে তিনি পড়ার ঘরের জানালার কাছে যান। কিন্তু কর্নেলকে ঘরে দেখতে পান না। ।

৫-২৯ মিঃ(এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে) লরেন্স রেডিং-এর বাড়ি থেকে মিসেস প্রাইস রিডলকে ফোন করা হয়।

৬-৩০–৬-৩৫ মিঃ–বন থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। লরেন্স রেডিং, অ্যানা প্রথেরো এবং মিস প্রাইস রিডলের জবানবন্দি থেকে জানা যায় শব্দটা আর একটু আগে শুনতে পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেটাই ঠিক।

৬-৪৫-লরেন্স রেডিং ভিকারেজে আসে এবং মৃতদেহ দেখতে পায়।

৬-৪৮–আমার সঙ্গে লরেন্সের দেখা হয়।

৬-৪৯–আমি মৃতদেহ আবিষ্কার করি।

৬-৫৫-হেডক মৃতদেহ দেখতে আসে।

পুনঃ মিস ক্র্যাম এবং মিস লেসট্রেঞ্জ–এই দুজন মহিলাকে মনে হয় সন্দেহের বাইরে রাখা যায়।

মিস ক্র্যাম বলেছে যে, সে তার কাজের জায়গায় ছিল। অবশ্য তার এই কথার কোন সমর্থন মেলেনি। অবশ্য এর সঙ্গে খুনের ঘটনার কোন যোগ নেই। এই কারণেই তাকে সন্দেহের বাইরে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়জন মিস লেসট্রেঞ্জ। তিনি কারো সঙ্গে ছটা বাজার পরে দেখা করবার কথা আছে বলে ডাঃ হেডকের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন?

মিস লেসট্রেঞ্জের সেই একজন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই একজনটি কে? মনে হয় কর্নেল প্রথেরোই সেই ব্যক্তি।

এটা বোঝা যাচ্ছে খুন হবার সময়ে মিস লেসট্রেঞ্জ অকুস্থলের কাছাকাছিই কোথাও ছিলেন।

মিঃ প্রথেরোর খুনের সঙ্গে মিস লেসট্রেঞ্জের কোন রকম যোগাযোগ কল্পনা করা যায় না। তার মৃত্যুতে মিস লেসট্রেঞ্জের লাভবান হবার মত কোন সূত্র নেই।

ইনসপেক্টর ব্ল্যাকমেল করবার যে তত্ত্ব তার সম্পর্কে বলেছিলেন, তা অর্থহীন। মহিলাকে দেখলে সেরকম মনেই হয় না।

আবার লরেন্স রেডিং-এর পিস্তলটা তার ঘর থেকে এই মহিলা সরিয়েছেন, এমন ধারণাও করা যায় না।

খুব মনোযোগ দিয়ে ছকটায় চোখ বোলালেন মিস মারপল। মনে হল খুশি হয়েছেন।

–পর্যালোচনা বেশ ভালই হয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম, আশা করি আমার লেখার সঙ্গে আপনি একমত

নীরবে ঘাড় নাড়লেন মিস মারপল।

–নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, একবার আপনি বলেছিলেন, এই ঘটনার ব্যাপারে একসঙ্গে সাতজনকে সন্দেহ করা যায়। ওকথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা পরিষ্কার হয়নি। এখন আপনার সন্দেহের আওতায় কে কে রয়েছেন?

মিস মারপল অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি লোককেই আমি সন্দেহ করি।

প্রত্যেকে যদি সমস্ত কথা খুলে বলে তাহলে ঘটনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগের ব্যাপারটা অনেকটাই বেরিয়ে আসবে। তখন একটা তত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেই সুযোগ তো পাওয়া যাচ্ছে না। আর ওই চিরকূটটা

-হ্যাঁ, চিরকূট কি হয়েছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

–আগেও আপনাকে আমি জানিয়েছিলাম, চিরকূটটা আমাকে খুবই ধাঁধায় ফেলেছে। আমার ধারণা, কোথাও একটা ভুল রয়ে গেছে।

–আমারও ধারণা, বললাম আমি; চিরকূটটা লেখা হয়েছিল ছটা পঁয়ত্রিশে। লেখাটাও কর্নেলের নয়-অন্য কারো। মনে হয় সে সকলের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই সময় ছটা কুড়ি লিখেছিল।

–যত যাই হোক, সবটাই ভুল বলেই আমার বিশ্বাস। জোরের সঙ্গে বললেন মিস মারপল।

–ভুল কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মিস মারপল এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, শুনুন ভিকার, আমার গেট পার হয়ে মিসেস প্রথেরো লাইব্রেরী ঘরের জানালার কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঘরের ভেতরে কাউকেই তার চোখে পড়েনি।

–না পড়ারই সম্ভব, কেননা কর্নেল থেরো লেখার টেবিলে বসে লিখছিলেন। বললাম। আমি।

ভুল, একেবারে ভুল, বললেন মিস মারপল, সময়টা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। তখন ছটা কুড়ি; আর চিরকূটটাতে কি লেখা ছিল? মিঃ প্রথেরো সাড়ে ছটার বেশি অপেক্ষা করতে পারবেন না। এই কথার যৌক্তিকতা বিচার করলে একথা কি মনে হয় না যে ছটা কুড়ি অবধি বসে থেকে ওই কথা কেউ লিখতে পারে না। যদি আমরা সকলে এ বিষয়ে একমত হই তাহলে মিঃ প্রথেরো চিরকূট লেখার জন্য লেখার টেবিলে বসেছিলেন একথা মনে করছি কেন আমরা?

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, ব্যাপারটা আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।

–বেশ, তাহলে ব্যাপারটাকে একবার ভালভাবে ভেবে দেখা যাক।

বলে মিস মারপল কি ভেবে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, মিসেস প্রথেরো জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তারপর সেখান থেকে সোজা স্টুডিও ঘরে চলে যান।

–ঘরে কেউ নেই এ সম্পর্কে মিসেস প্রথেরো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিল বলেই মনে করছেন?

–হ্যাঁ। কেননা ঘরটা সেই সময়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভেবে নিয়েছিলেন ঘর ফাঁকা।

–তাহলে বলতে চাইছেন–

-হ্যাঁ, বলছি শুনুন। এই ঘটনাটা থেকে আমরা তিনটে জিনিস ভাবতে পারি। প্রথমে যা মনে হয় সেটা হল, মিসেস প্রথেরো যেই সময়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছিলেন, খুনের ঘটনাটা তার আগেই ঘটে গেছে।

তবে আমার ধারণা, সেই সম্ভাবনা কম।

দ্বিতীয়ত যা মনে হয় তা হল, কর্নেল লেখার টেবিলে বসে চিরকুট লিখছিলেন। আমার ধারণা তিনি যে চিরকূট লিখছিলেন তার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওসব অপেক্ষা না করতে পারার কথা উনি লেখেননি।

মিস মারপল থামলেন কিছুক্ষণের জন্য। চোখবুজে কি ভাবলেন। পরে বলল, তৃতীয় ব্যাপার হল-মিসেস প্রথেরোর কথাই ঠিক। ঘরটা তখন যথার্থই ফাঁকা ছিল।

–তাহলে, আপনার কথামতো দেখা যাচ্ছে, মিঃ প্রথেরো লাইব্রেরী ঘরে একবার ঢুকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরে আবার ঘরে ফিরে আসেন। বললাম আমি।

মিস মারপল স্মিতহাস্যে ঘাড় নাড়লেন।

–কিন্তু উনি তা করতে গেলেন কেন?

এর পর আমাদের দুজনের মধ্যে আরো কিছু কথা হল। তাকে বিদায় জানাবার জন্য সদর দরজা অবধি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গেলাম। সেই সময় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তো দেখছি চিরকূটটা সমস্যা হয়েই রয়ে গেল।

চলতে চলতে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন মিস মারপল। বললেন, সমস্যা কেন হতে হবে। ওটা যে আসল চিরকূট তা আমি বিশ্বাস করি না। যা হোক, আজ চলি মিঃ ক্লেমেট।

মিস মারপল চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে অতি মাত্রায় বিস্মিত করে রেখে গেলেন। কিছুই যেন মাথায় ঢুকছিল না।

.

১৮.

ভিকারেজে লাইব্রেরি ঘরে বসেছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কর্নেল মেলচেটের আবির্ভাব ঘটল।

–শহরে একটা কাজে এসেছিলাম। ফেরার পথে ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। সেই সঙ্গে গলাটাও ভিজিয়ে নেওয়া যাবে।

–ওহো, নিশ্চয় নিশ্চয়। বসুন। অভ্যর্থনা জানালাম আমি।

–অবাক করবার মত খবরও অবশ্য একটা রয়েছে।

বেশতো শোনা যাবে। আগে আপনার গলা ভেজাবার ব্যবস্থাটা করা যাক। আমি উঠে গিয়ে হুইস্কি আর সোডা নিয়ে এলাম। তারপর দুটো গ্লাস দুজনে নিয়ে মুখোমুখি বসলাম।

-হ্যাঁ, আপনার অবাক-করা কথাটা এবারে বলুন। বললাম আমি।

-খবরটা অবাক হবার মতই। সেই চিরকুটটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? মিঃ প্রথেরো খুন হবার আগে যেটা লিখেছিলেন?

-হ্যাঁ, মনে আছে। ঘাড় নেড়ে বললাম আমি।

–একজন এক্সপার্টের কাছে সেটা আমরা পাঠিয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম ছটা কুড়ি লেখাটা অন্য কারোর হাতের কিনা। মিঃ প্রথেরোর হাতের লেখার নমুনাও সেজন্য পাঠানো হয়েছিল।

–রায় কি জানা গেল। আমি উদগ্রীব হলাম।

–এক্সপার্ট কি জানালো জানেন? চিরকূটের কোন লেখাই নাকি মিঃ প্রথেরোর হাতে লেখা নয়।

-তার মানে অন্য কারো হাতের লেখা মিঃ প্রথেরোর বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল?

–হ্যাঁ। ওটা জাল। ছটা কুড়ি লেখাটা এবং অন্য লেখাগুলোও ভিন্ন হাতে লেখা। মিঃ প্রথেরো ওই চিরকূট লেখেনইনি। ওরা এ বিষয়ে নিশ্চিত।

আমরা দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। পরে ধীরে ধীরে বললাম, আজ সন্ধ্যাবেলা মিস মারপল এসেছিলেন। তিনিও ঠিক ওই একই কথা বলে গেছেন।

–মিস মারপল?

-হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন, চিরকূটের ব্যাপারটাই ভুল। কর্নেল মেলচেট কথাটা শুনে যে খুশি হতে পারলেন না তা তার মুখভাব দেখেই বোঝা গেল।

–যে খুনটা করেছে, এই কথা কেবল সেই বলতে পারে।

ঠিক এমনি সময়ে ফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম। বললাম, আমি ভিকারেজ থেকে বলছি। আপনি কে কথা বলছেন?

জবাবে একটা অদ্ভুত ত্রস্ত গলা ভেসে এলো। উন্মত্তের মতো কেউ বলে চলল, হে ঈশ্বর আমি স্বীকারোক্তি দিতে চাই–আমি স্বীকারোক্তি দিতে চাই

কথা শেষ হবার আগেই লাইনটা কেটে গেল। বিস্মিত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। চেয়ারে ফিরে এসে মিঃ মেলচেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, এবারে আপনার পাগল হবার পালা।

–পাগল? আমার, কেন কি হল? বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন মেলচেট।

পর পর দুজন খুনের স্বীকারোক্তি দেবার পরে বলেছিলেন মনে আছে যে, এর পরে কেউ স্বীকারোক্তি দিতে এলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন?

-হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি

স্বীকারোক্তি দিতে চেয়ে আর একজন ফোন করেছিল। কিন্তু মাঝপথেই এক্সচেঞ্জ লাইনটা কেটে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ইনসপেক্টর চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। আমাকে হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

–এক্সচেঞ্জের সঙ্গে আমি কথা বলছি।

বেশ তো দেখুন চেষ্টা করে। আমি ততক্ষণ বাইরে যাচ্ছি। তবে গলার স্বরটা আমি মনে হয় চিনতে পেরেছি।

আমি দ্রুত পায়ে ভিকারেজ থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। রাত তখন এগারোটা। সেন্টমেরী মীড-এর গোটা গ্রামটাই নিঃঝুম হয়ে আছে। রোববার বলে সকলেই আজ আগে আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হস-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। একতলায় কেউ জেগে আছে মনে হল। একটা জানালার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত হসই জেগে রয়েছে। দরজার সামনে গিয়ে বেল বাজালাম।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ফের যখন বেল বাজাতে যাচ্ছি, দরজা খুলল হস-এর বাড়িউলি।

–জানালায় আলো দেখলাম, মনে হয় হস জেগে আছে। একবার দেখা করে যাই ওর সঙ্গে। বেশ তো যান। রাতের খাবার পরে আমি আর ওর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। ভদ্রমহিলা বলল।

জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে?

না–বাইরের কেউ আসেনি। পুরো সন্ধ্যাটাই ঘরে একা ছিল।

আমি ভেতরে পা বাড়ালাম। এক তলায় দুটো ঘর নিয়ে হস থাকে। একটা শোবার ঘর। দ্বিতীয়টা বসার ঘর। আমি দ্রুতপায়ে সেই ঘরে ঢুকলাম।

বড় একটা চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে হস। দেখে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙ্গল না।

পাশেই টেবিলে একটা ছোট ডালা খোলা বাক্স। আর অর্ধেক জলভর্তি একটা গ্লাস।

ঘরের চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। দোমড়ানো মোচড়ানো একটা কাগজ চোখে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

এগিয়ে গিয়ে পোঁটলা পাকানো কাগজটা তুলে সোজা করে নিয়ে পড়লাম।

পাশেই টেলিফোনটা ছিল। রিসিভার তুলে ভিকারেজে ফোন করলাম। কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। এনগেজড।

এক্সচেঞ্জে নাম্বারটা জানিয়ে রাখলাম। বলে দিলাম, পরে ফোন করতে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে চিঠিটা বার করলাম। ইনসপেক্টর মেলচেটকে দরজা খুলে দেবার সময়ে চিঠির বাক্সে পেয়েছিলাম এটা। তখন আর পড়ার সুযোগ হয়নি। এবারে সেটা খুললাম।

হস্তাক্ষর পরিচিতই মনে হল। কিন্তু ভাষার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এরকম হস্তাক্ষর কোথায় দেখেছি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মুহূর্তের মধ্যেই স্মরণে এসে গেল। হ্যাঁ, হুবহু একই রকম হস্তাক্ষরে লেখা ছিল মিঃ প্রথেরোর মৃতদেহের পাশ থেকে যে চিরকূটটা পাওয়া গিয়েছিল তাতে।

দুর্বোধ্য চিঠিটা আরো কয়েকবার পড়লাম। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। ঠিক এমনি সময়ে ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে, ইনসপেক্টর মেলচেট কথা বলছেন কি?

-হ্যাঁ, অপর পাশ থেকে জবাব এলোে; আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন? আমি কিন্তু একটু আগের ফোনটার সন্ধান পেয়ে গেছি।

–জানি আমি নাম্বারটা। বললাম।

–তাই বুঝি! তাহলে কি সেই জায়গা থেকেই এখন কথা বলছেন?

–হ্যাঁ, আমি সেখানেই আছি।

–তাহলে স্বীকারোক্তির কি হল?

–স্বীকারোক্তি পেয়েই গেছি বলতে পারেন।

–তার মানে, ইনসপেক্টরের স্বর উত্তেজিত শোনালো, তাহলে কি খুনীকে পেয়ে গেছেন?

আমিও যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করছিলাম। চেয়ারে শায়িত হস-এর দিকে একপলক তাকালাম। তারপর ভাজ খাওয়া চিঠিটা, ডালা-খোলা ছোট্ট বাক্সটা–সব কিছুর ওপরেই দৃষ্টি ঘুরে এলো আমার। বাক্সটার ওপরে সিরুবিম নাম লেখা।

ইনসপেক্টরকে বললাম, এখনো সঠিক বলতে পারছি না। আপনি এখুনি এখানে চলে আসুন।

এরপর ঠিকানাটা দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। দেখি, ইনসপেক্টর আসুক।

হস-এর উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ইনসপেক্টর মেলচেটের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

ঘরে পা দিয়ে ইনসপেক্টর প্রথমে নিদ্রিত হস-এর দিকে তাকালেন। পরে আমার দিকে ফিরে বললেন, কি ব্যাপার? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

আমি হস-এর ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটা বাড়িয়ে দিলাম। চিঠিটা উঁচু গলায় পড়তে লাগলেন তিনি প্রিয় ভিকার,

খুবই অপ্রিয় একটা বিষয় আমাকে বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তবে লিখেই জানাব ঠিক করেছি। পরে আমরা কোন এক সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। সাম্প্রতিক খুনের ঘটনার সঙ্গে এটার যোগ রয়েছে।

কোন নিযুক্ত যাজককে দোষী করা খুবই যন্ত্রণাদায়ক বলে আমার মনে হচ্ছে। তবে কষ্ট হলেও ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া আমার কর্তব্য। যেমন ধরুন...

চিঠি থেকে মুখ তুলে ইনসপেক্টর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

চিঠিটা ওখানেই শেষ হয়েছে। শেষ কথাগুলো খানিকটা আঁকাবাঁকা আঁচড়ের মত, লিখতে লিখতে যেন শরীর এলিয়ে পড়েছে; বোঝা যায়।

ইনসপেক্টর মেলচেট একটা গভীর শ্বাস নিল। হস-এর দিকে তাকাল।

-তাহলে এখানেই শেষ হল রহস্য। অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েই হস স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

কথা শেষ করে ইনসপেক্টর হস-এর দিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে আলতো করে নাড়া দিল। পরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন।

নেশা করেছে। ঘুম নয়।

বলে ডালা-খোলা বাক্সটার দিকে তাকালেন। ঘুরে সেটা তুলে নিলেন।

–এ কি...

-হ্যাঁ, আমারও ধারণা তাই, বললাম আমি, আগে একদিন আমাকে ওটা দেখিয়েছিল। বলেছিল, ওটা বেশি খাওয়া বিপজ্জনক। নিরাপদ পথ ভেবে ওটা খেয়েই নিজেকে শেষ করেছে।

খুনীকে হাতে পেলে পুলিশ অফিসাররা সম্ভবত সকলেই একরকম ব্যবহার করে থাকে। ইনসপেক্টর মেলচেটও অস্বাভাবিক তৎপর হয়ে উঠলেন। কি করে খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে সেই চিন্তাই মন জুড়ে বসেছে।

দুপা এগিয়ে ঝট করে রিসিভারটা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর লাইন পেলেন। বললেন, কে ডাঃ হেডক? আপনি এখুনি উনিশ নম্বর হাই স্ট্রীটে চলে আসুন। হ্যাঁ, হস মনে হচ্ছে কোন একটা ওষুধ বেশি খেয়ে ফেলেছে। চটপট চলে আসুন।

চিন্তিত ভাবে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। অস্থিরভাবে ঘরের ভেতর পায়চারী শুরু করলেন।

একসময় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ওই চিঠিটা কোথায় পেয়েছেন আপনি?

–মেঝেয় পড়েছিল দোমড়ানো অবস্থায়। সম্ভবতঃ হস-এর হাতেই ছিল–

–খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভিকারেজের ঝি-টাই দেখছি ঠিক ছিল। যে চিঠিটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা জালই ছিল। ভাল বলতে হয় যে ও চিঠিটা নষ্ট করেনি।

একটু থেমে কি ভাবলেন। পরে বললেন, যদি এটা পাওয়া না যেত তাহলে খুনীকে ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। অবশ্য খুনীরা কোন না কোন সময়ে এরকম একটা ভুল করে থাকে। সেই ভুলটাই তাদের ধরিয়ে দিতে প্রধান ভূমিকা নেয়। কি ব্যাপার মিঃ ক্লেমেট, মনে হচ্ছে আপনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন।

–হ্যাঁ, তাই, বললাম আমি, অনেক সময় হসকে আমার কেমন সন্দেহজনক মনে হত। কিন্তু এরকমটা কখনো ভাবতে পারিনি...

বাইরে গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। ইনসপেক্টর সংক্ষেপে তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন।

ডাক্তার হেডক ভ্রূ কোচকালেন। হস-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। হাত টেনে নিয়ে নাড়ী দেখলেন। চোখের পাতা টেনে পরীক্ষা করলেন।

আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন, ওকে যদি ফাঁসিতে লটকাতে চাও, তাহলে এখনো ক্ষীণ আশা আছে, চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচানো যেতে পারে।

সঙ্গে করে আনা বাক্সটা খুললেন ডাক্তার। ঝটপট একটা ইনজেকশান করলেন হস-এর হাতে।

পরে ইনসপেক্টর মেলচেটকে বললেন, এই মুহূর্তে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। আপনারা হাত লাগান একটু আমি ওকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছি।

আমরা দুজনে ধরাধরি করে হসকে ডাক্তারের গাড়িতে তুলে দিলাম। ডাক্তার ড্রাইভারের সিটে বসতে বসতে বললেন, তবে মিঃ মেলচেট, মনে হয় আপনারা ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারবেন না।

তার মানে ও আর বাঁচবে না বলছেন? বললেন ইনসপেক্টর।

বাঁচা না বাঁচা দুটোই অনিশ্চিত। আমি সেকথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি, হস যদি বেঁচেও যায়, খুনের জন্য ওকে দায়ী করা যাবে না। দরকার হলে তার জন্য আমি সাক্ষ্য দেব।

ডাক্তার গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। আমরা আবার ঘরে ফিরে এলাম। ইনসপেক্টর বললেন, ডাক্তারের কথা বলার মানে কি ভিকার?

আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। হস যে এনসিথাইসিস ল্যাথার্জীতে ভুগছে সেকথা ওকে বললাম।

-ওটা তো অনেকটা মানসিক অবসাদের রোগ তাই না? স্লীপিং সিকনেস। ইনসপেক্টর বললেন, ডাক্তার কি মনে করছেন, এখনকার দিনে কুকর্মের পেছনে যুৎসই কারণ দেখাতে পারলেই অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে?

আমি জবাবে কিছু বলবার আগেই হঠাৎ দরজা খুলে গেল। মিস মারপল ঘরে ঢুকলেন।

–আপনাদের কাজের মধ্যে এসে পড়লাম, দুঃখিত। শুনলাম হস অসুস্থ, তাই চলে এলাম। মনে হল, যদি ওর জন্য কিছু করার দরকার হয়।

–এসে ভালোই করেছেন, বললেন ইনসপেক্টর, তবে আপনার করার মত কিছু নেই আপাতত ডাক্তার হসকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছেন।

মিস মারপল যেন খুশি হলেন কথাটা শুনে বললেন, যা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হস হাসপাতালে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ওর জীবনের আশঙ্কা নেই তো?

–তা বলতে পারছি না। বললেন ইনসপেক্টর।

ডালা-খোলা শূন্য বাক্সটার দিকে চোখ পড়ল মিস মারপলের। বললেন, ওটা বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেলেছিল মনে হচ্ছে?

আমি এ কথার জবাব না দিয়ে হস-এর অসমাপ্ত চিঠিটা মিস মারপলের দিকে এগিয়ে দিলাম।

চিঠিটা পড়লেন তিনি। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না।

–এরকম একটা ব্যাপারই নিশ্চয় আপনি অনুমান করেছিলেন? বললাম আমি।

–তা করেছিলাম, বললেন মিস মারপল, আচ্ছা ভিকার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি

বলে অন্যমনস্কভাবে চিঠিটার দিকে একবার তাকালেন। পরে বললেন, আপনি এখানে এসেছিলেন কেন? এ সময়ে তো আপনার আসার কথা নয়।

ফোনের কথাটা মিস মারপলকে বলতে হল। বললাম, ফোনে হস-এর গলার স্বর ধরতে পেরেছিলাম। তাই ব্যাপারটা কি দেখতে চলে এসেছিলাম।

কিন্তু মারপল চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ালেন। বললেন, যা বুঝতে পারছি, সেজন্যেই ঠিক সময়ে আপনি এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

–ঠিক সময়? কিসের ঠিক সময়? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

–হস-এর জীবন বাঁচাবার কথাই বলছি আমি। আর দেরি হয়ে গেলে হয়তো ওকে বাঁচানো যেত না।

-হস বেঁচে উঠলে ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে উঠবে। কেবল ওর নিজের জন্য নয়, সবার জন্যই ওর বেঁচে ওঠা দরকার। আমরা এখন সত্যটা জানি। আর...

মিস মারপল অদ্ভুতভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, একথাটাই সে আপনাকে এবং অন্য সকলকে ভাবাতে চেয়েছিল। আপনি ভাবছেন সত্যটা জেনে গেছেন। আপনি তাই ভাবছেন হস-এর বাঁচাটা সবার পক্ষে ভাল। সব কিছুই ঘটনার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। চিঠি, অতিমাত্রায় ওষুধ, হস-এর মানসিক অবস্থা আর তার স্বীকারোক্তি–সবই মনে হচ্ছে একই সূত্রে বদ্ধ–কিন্তু এ সবই ভুল...ভুল।

আমরা দুজনেই চমকে মিস মারপলের দিকে তাকালাম।

মিস মারপল বলে চললেন, হসকে যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। তার পক্ষে ওই জায়গাটাই নিরাপদ। ওখানে কেউ ওর অনিষ্ট করতে পারবে না।

একটু থেমে ফের বললেন, যদি ঈশ্বরের দয়ায় হস বেঁচে ওঠে তাহলে সত্য রহস্যটা ওর কাছ থেকেই জানা যাবে।

–সত্য রহস্য মানে?

–হ্যাঁ সত্য রহস্য। খুন তো দূরের কথা হস মিঃ প্রথেরোকে ছোঁয়নি পর্যন্ত।

–কিন্তু টেলিফোন, অতিরিক্ত ওষুধ, অসমাপ্ত চিঠি–এসব থেকেই তো আসল রহস্যটা বোঝা যাচ্ছে।

হাসলেন মিস মারপল। বললেন, সেকথাই তো বলছি। খুনী বড় চতুর, সে একথাটাই আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিল।

-খুন বলতে আপনি কাকে বোঝাচ্ছেন? বললাম আমি।

–আমি প্রকৃত খুনীর কথাই বলছি–অর্থাৎ মিঃ লরেন্স রেডিং-এর কথাই বলছি।

.

১৯.

ভীষণভাবে চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। এমন সরাসরি কি করে নাম বলতে পারছেন মিস মারপল? কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল, এমন অসংযত কথা নিশ্চয় স্বাভাবিক অবস্থায় বলছেন না ভদ্রমহিলা।

আমি এবং ইনসপেক্টর পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হয়ে রইলাম। অবশেষে ইনসপেক্টরই প্রথম কথা বললেন, এ একেবারেই অসম্ভব মিস মারপল। লরেন্স রেডিং সম্পূর্ণ ভাবেই আমাদের সন্দেহের বাইরে।

-খুবই স্বাভাবিক, বললেন মিস মারপল, লরেন্স বরং নিজেকে খুনী প্রমাণ করবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

-ওটা আমাদের বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল ছিল তার, বললেন মিস মারপল, আপনার নিশ্চয় মনে আছে, লরেন্সের স্বীকারোক্তির কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই খবর শোনার পর আমার সমস্ত ভাবনা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। কেননা ওকে বরাবরই আমি নির্দোষ বলে ভেবে এসেছিলাম।

–তাহলে আপনি লরেন্স রেডিংকেই খুনী বলে সন্দেহ করছেন?

–সত্যিকথা বলতে কি, বইতে প্রায়ই দেখা যায়; সন্দেহভাজন নয় এমন ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত খুনী বলে প্রমাণ হয়। কিন্তু বই-এর কোন কিছুই বাস্তবের সঙ্গে আমি মেলাতে যাই না। মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে আমার খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

সব কিছু দেখে শুনে আমি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলাম, ভদ্রমহিলা পুরোপুরি লরেন্সের কবজায় চলে গেছেন। অবশ্য লরেন্স খুব ভালোভাবেই জানত মিসেস প্রথেরো চালচুলোহীন এক মহিলা। এমন এক সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মত বোকা লরেন্স কোনকালেই ছিল না।

সেই কারণেই কর্নেল প্রথেরোকে সরিয়ে দেওয়া তার দরকার হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত করেও ছিল তাই।

আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে ওরকম চমৎকার দেখতে একজন মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা বলতে কিছু ছিল না।

মিস মারপল থামলেন। বোঝা যাচ্ছিল ইনসপেক্টর খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এ মেনে নেওয়া যায় না। সম্পূর্ণ অসম্ভব। ছটা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত লরেন্সের গতিবিধি আমরা খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেছি। আর ওই সময়ের মধ্যে কোন মতেই যে মিঃ প্রথেরোকে গুলি করা হয়নি সে-কথা ডাঃ হেডকও বলেছিলেন। একজন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আমাদের থেকে বেশিই বলা চলে। তা যদি না হয় তাহলে বলতে হয়, ডাক্তার হেডক মিথ্যা কথা বলেছেন।

–ডঃ হেডকের সাক্ষ্য কোথাও ভুল নেই। বললেন মিস মারপল। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। তবে এটাও সত্যিকথা যে লরেন্স নয় মিঃ প্রথেরোকে গুলিটা করেছিল মিসেস প্রথেরোই।

আরও একবার চমকে উঠলাম আমরা। মিস মারপল মাথা নাড়লেন, শালটা কাঁধে জড়িয়ে নিলেন। পরে বললেন, আমার কথা সম্পূর্ণই ঠিক, এখনো পর্যন্ত অবশ্য বলতে পারছি না। এটাও ঠিক যে কেবল বিশ্বাস দিয়ে কোন অভিযোগ খাড়া করা যায় না। তার জন্য দরকার হয় নির্ভুল প্রমাণ। কারো বক্তব্য বা কাজ যদি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে না মেলে তাহলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

আমার নিজের ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নয়। একটা বিষয়ে এখনও খটকা লেগে রয়েছে। হঠাৎই সেটা আমার নজরে পড়েছে।

বলে একটু থামলেন মিস মারপল। কি ভাবলেন। পরে বললেন, ভিকারের লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে আচমকা জানলার খোপে একটা কালো মত জিনিস আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল।

–অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য সব কথা আপনি শোনাচ্ছেন মিস মারপল। বলে উঠলেন ইনসপেক্টর।

একথায় কান না দিয়ে মিস মারপল বলে চললেন, যা ভেবে বিশ্বাস করেছিলাম তার জন্য আমি দুঃখিত।

কেননা, ওদের দুজনকেই আমি পছন্দ করতাম। কিন্তু মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির কথা তো আপনার অজানা নয়।

ঘটনার শুরুতেই ওদের দুজনকে বোকার মত স্বীকারোক্তি দিতে দেখে আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি ভুল বুঝেছিলাম। দোষী হিসেবে অন্য অন্য লোককে নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে ছিল আমার। কর্নেল প্রথেরো খুন হলে কোন না কোন ভাবে তাদের লাভবান হবার কথা এমন সব লোক।

–একারণেই আপনি বলেছিলেন খুনের ব্যাপারে সাতজনকে সন্দেহ করা চলে? বললাম আমি।

-হ্যাঁ, অনেকটাই তাই, হাসলেন মিস মারপল, ধরুন আপনার ওই আর্চার। মদ খেলে লোকটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তারপর ধরুন আপনার ওই মেরী। সে অনেকদিন

আর্চারের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। মেয়েটা খুবই বদমেজাজি। সুযোগ এবং উদ্দেশ্যও অনুকূলে। মেরী বাড়িতে একলাই ছিল। আর ওই বুড়ি আর্চার খুব সহজেই লরেন্সের বাড়ি থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিতে পারত।

এরপর ধরুন লেটিসের কথা। টাকা আর স্বাধীনতার জন্য সে সবকিছুই করতে পারে। ওর মত অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি দেখেছি যাদের নৈতিক জীবন বলে কিছু নেই।

ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বোধ করলেও আমরা নিঃশব্দে মিস মারপলের কথা শুনে যেতে, লাগলাম।

মিস মারপল বলে চললেন, টেনিস র‍্যাকেটের কথাটাই এবারে ধরা যাক।

–টেনিস র‍্যাকেট?

-হ্যাঁ টেনিস র‍্যাকেট। ভিকারেজের গেটের কাছে পড়ে ছিল সেটা। মিসেস প্রাইস রিডলের বাড়ির ঝি ক্লারা সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে–খেলা থেকে ফেরার যে সময়ের কথা ডেনিস বলেছিল; তার আগেই ফিরে এসেছিল।

আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বছর খোল বয়সের ছেলেদের ব্যবহার স্বভাবতই খানিকটা সন্দেহজনক আর ভারসাম্যহীন হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবেও ডেনিসের বয়সী ছেলেরা আপনার কিংবা লেটিসের জন্য অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। আর উদ্দেশ্য থাকলে তো রীতিমত বেপরোয়া হয়ে ওঠে–সেই কাজের পরিণতি যাই হোক না কেন।

ডেনিস আর লেটিসের মধ্যে যে প্রেমের একটা ব্যাপার চলেছে আশা করি সেটা আপনারও নজরে পড়েছে।

কথা শেষ করে মিস মারপল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

ইনসপেক্টর একপলক আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

মিস মারপল পুনরায় বলতে শুরু করলেন, এবারে আসি আপনার আর হতভাগ্য হস-এর কথায়।

–আমি! সবিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

–হ্যাঁ! ঘাবড়াবার কিছু নেই ভিকার। আপনি যে সত্যই কিছু করেছেন অতটা আমি ভাবছি না। তবে সেই চুরি যাওয়া টাকাটার প্রসঙ্গ আমি মনে করিয়ে দিতে চাইছি।

তার জন্য আপনি অথবা হস দুজনের যে কোন একজন দায়ী।

মিসেস প্রাইস রেডলি কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ করেছিল। তার কারণও অবশ্য ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে তল্লাসীর কথা যখন সে বলেছিল, একমাত্র আপনিই তখন প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

আমি নিজে অবশ্য সন্দেহ করতাম হস-কেই।

যাই হোক, আমার সন্দেহের আওতার সাত জনের মধ্যে পরবর্তী নামটি হল আপনার স্ত্রী গ্রীসলডা।

মিসেস ক্লেমেট অবশ্যই সমস্ত সন্দেহের বাইরে। বাধা দিলেন ইনসপেক্টর মেলচেট, কেননা তিনি ঘটনার অনেক আগেই শহরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন ছটা পঞ্চাশের ট্রেনে।

মিস মারপল হাসলেন। বললেন, সে তো তার নিজের কথা। একজন যা খুশি বলতেই পারে, তাই বলে সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে কি মেনে নেওয়া ঠিক?

আপনারা জানেন কিনা জানি না, সে রাত্রে ছটা পঞ্চাশের ট্রেন প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে এসেছিল। তাছাড়াও, আমি নিজের চোখেই গ্রীসলডাকে রাত সওয়া ছটার সময় ওল্ড হলের দিকে যেতে দেখেছি।

তাহলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিতে পারি ছটা পঞ্চাশের আগের কোন ট্রেনেই গ্রীসলডা শহর থেকে ফিরেছে।

মিস মারপল অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে কেবল জিজ্ঞাসাই ছিল না। আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম। গ্রীসলডা যে নির্ধারিত ট্রেনের আগে ফিরেছে একথা আমাকে জানায়নি।

অস্বস্তি কাটাবার জন্যই কিছুক্ষণ আগে যে বেনামী চিঠিটা খুলেছিলাম সেটা পকেট থেকে বার করে আনলাম।

চিঠিতে লেখা ছিল, লরেন্স রেডিং-এর বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে গ্রীসলডাকে বেরতে দেখা গিয়েছিল ছটা বেজে কুড়ি মিনিটে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নানা রকম সন্দেহ খেলে গেল মাথায়। মনে হতে লাগল আমি যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।

একটা দৃশ্য বড় অস্পষ্ট হয়ে উঠল–গ্রীসলডা আর লরেন্স ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর মিঃ প্রথেরো ব্যাপারটা জানতে পেরে গেছেন। তাতে তারা দুজন খুবই ভীত হয়ে পড়েছে।

মিঃ প্রথেরো ঘটনাটা বলে দিতে পারেন সন্দেহ করে দুজনেই মরীয়া হয়ে ওঠে। সেই পথ বন্ধ করার জন্য তারপর গ্রীসলডা মিঃ প্রথেরোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে এবং লরেন্সের ঘর থেকে তার পিস্তলটা চুরি করে।

সাপের মত জড়িয়ে ফেলবার আগেই এ দুঃসহ ভাবনাটাকে মাথা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। মিস মারপল, এরকম কোন ভাবনা ভাবছে কিনা বুঝতে পারছি না।

চিঠিটা, মিস মারপলের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়লেন। নীরবেই আমাকে ফেরত দিলেন।

কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থেকে তিনি বলতে শুরু করলেন, এখন এই রহস্য সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি তা আপনাদের বলছি। আপনারা আমার কথা মেনে নেবেন এমন কথা আমি বলতে চাই না।

তবে না মানলেও আমার কিছু যায় আসে না। তবে কর্তব্যজ্ঞানেই আমি আমার ভাবনার কথা প্রকাশ করছি।

কথা শেষ করে থামলেন মিস মারপল। চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। মনে হয় মনে মনে ঘটনাগুলো সাজিয়ে নিলেন।

-খুনের ঘটনার রহস্য নিয়ে আমি নিজে যে ভাবে ভেবেছি তা এইরকম, মিস মারপল বলতে শুরু করলেন, এই খুনটার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাত্রেই। লরেন্স জানত ভিকার নেই, তবু সে ভিকারের সঙ্গে দেখা করার অছিলা নিয়ে ভিকারেজে আসে। সেই সময় পিস্তলটা সে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। ফাঁকা লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে সে পিস্তলটা জানালার একপাশে লুকিয়ে রেখে দেয়।

ভিকার ফিরে এলে লরেন্স তাকে জানায় যে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখান থেকে চলে যাবে।

এর পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লরেন্স নর্থলজ থেকে মেয়েলি গলা নকল করে ভিকারকে ফোন করে।

একটু থেমে গায়ের শালটা ঠিক করে নিলেন মিস মারপল। আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। নিঃশব্দে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এ তো গেল একদিকের কথা। এবারে অপর দিকটা দেখা যাক। মিঃ এবং মিসেস প্রথেরো গাড়ি করে গ্রামের দিকে বেরিয়ে ছিলেন।

তখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত ছিল। মিসেস প্রথেরো বেরোবার সময় কোন হাতব্যাগ সঙ্গে নেননি। কোন মহিলা বাইরে বেরুবার সময় হাতব্যাগ সঙ্গে নেয়নি, এ ঘটনাটা যে খুবই অস্বাভাবিক নিশ্চয় আপনারা তা স্বীকার করবেন।

যাই হোক, মিসেস প্রথেরো আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যায় তখন সময় ছটা বেজে কুড়ি মিনিট।

সে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে গল্পও করে। সঙ্গে কোন অস্ত্র যে নেই এটা আমাকে বোঝাবার জন্যই সে এটা করেছিল। আমার দৃষ্টি যে খুব প্রখর তা তার অজানা ছিল না। তাই পরিকল্পনা করেই ব্যাগছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

এরপর ভিকারেজের বাড়িটা ঘুরে লাইব্রেরী ঘরের পেছনে জানলার দিকে চলে যায়। সে জানত পিস্তলটা কোথায় আছে। সেটা তুলে নেয়।

কর্নেল প্রথেরো সেই সময় লাইব্রেরী ঘরে লেখার টেবিলে বসেছিলেন। ভিকারকে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখছিলেন।

আপনারা তো জানেন কর্নেল খানিকটা কানে খাটো ছিলেন। সেই কারণেই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর স্ত্রী কখন পিস্তল হাতে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অ্যানা প্রথেরো নির্ভুল নিশায় মাথায় গুলি করে। তারপর পিস্তলটা সেখানেই ফেলে রেখে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। দ্রুতপায়ে বাগানে চলে আসে সে। স্টুডিও ঘরে লরেন্সের সঙ্গে তার দেখা হয়। দুজনে ঘরে ঢুকে যায়।

অ্যানা প্রথেরো যথেষ্ট চতুর। সে জানত আমি বাগানে রয়েছি। আর যতক্ষণ ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে না আসে স্বাভাবিক কৌতূহলের বশেই আমি যে বাগান ছেড়ে নড়ব না তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল।

কিছুক্ষণ পরেই ওরা স্টুডিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের হাবভাব বা ভঙ্গিতে কোনরকম অস্বাভাবিকতা ছিল না। উৎফুল্লভাবেই তারা কথাবার্তা বলছিল।

এ পর্যন্ত সবই ছিল নিখুঁত। কোথাও দৃষ্টিকটু কিছু ছিল না। কিন্তু এর পরেই ওরা পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে চলে না গিয়ে প্রথম ভুলটা করে বসল। স্বাভাবিক দুর্বলতার বশেই খুবই দৃষ্টিকটু ব্যাপার ওরা করে ফেলে।

নিজেদের নির্দোষ দেখাবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই ওরা কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী বজায় রেখে চলছিল।

মিনিট দশেক পরেই লরেন্স হঠাৎ ভিকারেজে ঢুকে পড়ে। সম্ভবত সে দূর থেকেই ভিকারকে আসতে দেখেছিল।

লাইব্রেরী ঘরের মেঝে থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা কুড়িয়ে পকেটে চালান করে দেয়। অন্য কালিতে অন্য হাতে লেখা জাল চিঠিটা তার সঙ্গেই ছিল। সেটা টেবিলের ওপরে রেখে দেয়।

এই সময়েই অপ্রত্যাশিতভাবে তার নজরে পড়ে যায় মিঃ প্রথেরোর ভিকারকে লেখা চিঠিটা। সেটা পড়েই সে বুঝতে পারে, ভবিষ্যতে চিঠিটা তার কাজে লাগতে পারে। লরেন্স অসাধারণ বুদ্ধিমান, সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠিটা পকেটে পুরে নেয়। তারপর আধঘণ্টা ফার্স্ট চলে ঘড়িটা জেনেও ত্রস্ত হাতে কাটা সরিয়ে দেয়।

ঠিক সময় হিসাব কষেই ঘর থেকে বেরিয়ে লরেন্স ভিকারেজের সদর দরজার দিকে বেরিয়ে যায় যাতে ভিকারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। নির্ভুল হিসাব ছিল তার। ঠিক গেটের মুখেই দুজনের দেখা হয়ে গেল। উন্মাদের মত অভিনয় করে ভিকারকে কিছু আঁচ করবার সুযোগই দিল না।

কথা বলতে বলতে মিস মারপল আমার আর ইনপেক্টরের মুখের দিকে তাকালেন পর পর। পরে আবার বলতে শুরু করলেন।

–পাকা বুদ্ধির মানুষ লরেন্স। একজন খুনীর মতই পরিষ্কার মাথা। সেই জন্যই নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করতে গেল। সঙ্গে পিস্তলটাও নিয়ে গেল। তবে সাইলেন্সরটা রেখে গেল।

দক্ষ অভিনেতার মত নিজেকে খুনী বলে জাহির করার চেষ্টা করল। বাস্তবিক ওর স্বীকারোক্তি সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছিল।

মিস মারপলের কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম, সেদিন রাতে জঙ্গলের মধ্যে একটা শব্দ হয়েছিল, আপনিও তো শুনেছিলেন, সেটা তাহলে কি ছিল? শব্দটা কি আকস্মিক কোন ঘটনা?

না, প্রিয় ভিকার। মিস মারপল বললেন, ওটা অবশ্যই আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। সকলকে শোনাবার জন্যই শব্দটা করা হয়েছিল। তা না হলে মিসেস প্রথেরো সন্দেহের মুখে পড়তেন।

–শব্দটা কি কোন

-না, সেটার জন্য লরেন্স কি ব্যবস্থা করেছিল সঠিক বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, পিকরিক এসিডের ওপর ভারি কোন বস্তু ফেললে, ওরকম শব্দ হওয়া সম্ভব। ভিকার, আপনার নিশ্চয় মনে আছে, আপনি যখন জঙ্গলে ঢুকেছিলেন, লরেন্সের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় একটা পাথর ছিল তার হাতে।

পরে ক্রিস্টালটা আপনি যেখানে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, আপনাদের দেখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই। চতুর লরেন্স ক্রিস্টালটার ওপরে নিশ্চয় পাথর ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। কুড়ি মিনিট মত সময় লেগেছিল সেটা পুড়ে গলে যেতে। “ এই হিসেব থেকে বোঝা যায় বিস্ফোরণটা হয়েছিল ছটা তিরিশ মিনিট নাগাদ। ঠিক ওই সময়েই তারা দুজন স্টুডিওঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

নিঃসন্দেহে খুবই নির্ঝঞ্ঝাট বিস্ফোরণ ছিল সেটা। বিস্ফোরণের পরে কেবল একটা পাথরই সেখানে পড়েছিল। চতুর লরেন্স এই প্রমাণটাও রাখতে চায়নি সেখানে। পাথরটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল।

মিস মারপল ঘটনাটার এমন সুন্দর বিশ্লেষণ করছিলেন যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে বললাম, মনে হয় আপনি ঠিকই বলছেন। আমার মনে আছে, সেদিন জঙ্গলে আমাকে দেখে লরেন্স চমকে উঠেছিল। সেই সময় ব্যাপারটা আমার খুব স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি...

-হ্যাঁ, আপনাকে ওরকম জায়গায় দেখবে বলে সে আশা করেনি, তাই স্বাভাবিক ভাবেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরকম লোকের নার্ভ সহজে ফেল করে না। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল। একটা মিথ্যা গল্প শুনিয়েছিল আপনাকে। বলেছিল, আমার বাগানের জন্য পাথরটা নিয়ে আসছে।

তার এই মিথ্যা গল্প থেকেই আমি রহস্যের একটা সূত্র পেয়ে গিয়েছিলাম।

কথা শেষ করে মিস মারপল থামলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা শুনে যাচ্ছিলেন ইনসপেক্টর মেলচেট। মিস মারপল থামলে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, চমৎকার–অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

এর পর পকেট থেকে হস-এর ঘরে আমার কুড়িয়ে পাওয়া দুমড়ানো চিঠিটা বার করে মিস মারপলকে দেখিয়ে বললেন, আপনার যুক্তিতে কোথাও ফাঁক নেই এটা সত্যি কথা। ঘটনার সঙ্গে বিশ্লেষণ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হস সম্পর্কে আপনি কি ব্যাখ্যা দেবেন। সে কেন ফোন করতে গেল আর কেনই বা স্বীকারোক্তি দিতে গেল...।

-ওটা ছিল তার ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা, বললেন মিস মারপল, গির্জার ফাণ্ডের টাকাটা সরিয়েছিল হসই। পরে এই দুষ্কর্মের জন্য তার অনুশোচনা হয়। তখন সে ঠিক করে সবকিছু স্বীকার করবে।

এই চিঠিটা পেয়ে লরেন্স লুকিয়ে রেখেছিল। কার জন্য প্রয়োগ করা যায় সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

অবশ্য পরে সে বুঝতে পেরেছিল, হসকে দিয়েই চিঠিটা ব্যবহার করবে। আমার ধারণা এই মতলব মাথায় নিয়েই লরেন্স গতরাত্রে হস-এর বাড়ি আসে। নানান গল্পে বেশ কিছু সময় তার সঙ্গে কাটায়।

বলতে বলতে একটু থামলেন মিস মারপল। একমুহূর্ত চিন্তা করলেন। পরে বললেন, আমার সন্দেহ হয়, সেই সময় নিজের ক্যাসেট বাক্সের সঙ্গে লরেন্স হস-এর ক্যাসেট বাক্স বদল করে নেয়। তারপর কৌশলে হস-এর ড্রেসিংগাউনের ভেতরে চিঠিটা ঢুকিয়ে দেয়।

হস কিছুই বুঝতে পারে না। সে রাতে বদলা বদলি করা ক্যাসেট থেকে মারাত্মক ক্যাপসুল গলাধঃকরণ করে। লরেন্স দেখাতে চেয়েছিল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে হস আত্মহত্যা করেছে।

অনুশোচনাটা কর্নেল প্রথেরোকে গুলি করে হত্যা করার জন্য। সকলে অবশ্য সেকথাই ভাবতো।

–আচ্ছা বেশ, এ না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ওই ফোনটার ব্যাখ্যা আপনি কি দেবেন? লরেন্সের বাড়ি থেকে যেটা প্রাইস রিডেলকে করা হয়েছিল?

-হ্যাঁ, ওটা একই সময়ে ঘটে যাওয়া একটা আকস্মিক ঘটনা বলব আমি। ফোনটা করেছিল গ্রীসলডা।

ডেনিস আর গ্রীসল পরিকল্পনা করেই এই কাণ্ডটা করে বলে আমার ধারণা। ওরা শুনছিল যে মিসেস প্রাইস রিডলে ভিকারের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই তাকে চুপ করাবার জন্যই হুমকি দেবার এই বিপজ্জনক পথটা বেছে নিয়েছিল।

গ্রীসলডা যেই সময়ে ফোনটা করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই জঙ্গলের ভেতর থেকে গুলি করার মত শব্দ ভেসে আসে। যেহেতু প্রায় একই সময়ে ঘটনা দুটো ঘটে যায় তাই এই দুইয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ইনসপেক্টর মেলচেট হঠাৎ কেমন নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, আপনার বিশ্লেষণ চমৎকার। কিন্তু এভাবে যে সাধারণ তত্ত্বটা দাঁড়াচ্ছে তা প্রমাণ করবার মতো তো কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ ছাড়া কিছুই ধোপে টিকবে না।

তা আমি জানি, বললেন মিস মারপল, তবে আমার বিবরণটাকে আপনি সত্য বলেই বিশ্বাস করতে পারেন। আর যদি আরও নিঃসংশয় হতে চান তাহলে একটা ফাঁদ পাতা যেতে পারে।

.

২০.

–ফাঁদ? কি ধরনের ফাঁদ।

চমকে উঠে ইনসপেক্টর মিস মারপলের দিকে তাকালেন। আমারও একই রকম অবস্থা।

-হ্যাঁ ফাঁদ। ধরুন যদি লরেন্স রেডিংকে ফোন করে সতর্ক করা হয়?

–কি ভাবে সে কাজটা করব বলছেন আপনি?

–যেমন ধরুন, সে যে হস-এর ক্যাসেট বাক্স বদলাবদলি করেছে এই ঘটনা দেখে ফেলেছে এমন একজন ফোনটা করবে এবং বলবে যে সে সব ঘটনা দেখে ফেলেছে। রেডিং যদি নির্দোষ হয় তাহলে কথাগুলোর মানে সে বুঝতে পারবে না। আর যদি না হয় তাহলে নিশ্চয় বোকার মত কিছু একটা করবে।

-হ্যাঁ, এটা তাকে যাচাই করার মোক্ষম ফঁদ। বললেন ইনসপেক্টর, তবে ডাক্তার হেডককে নিয়ে সন্দেহ আছে, তিনি কি এতে রাজি হবেন?

খানিক দূরেই বসেছিলেন ডাক্তার। আমি তার দিকে তাকালাম। মনে হল আমাদের মধ্যে মিস মারপলকে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছেন। তাকে খুব ক্লান্তও দেখাচ্ছিল।

ইনসপেক্টর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, আমরা কি নিয়ে কথাবার্তা বলছি, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।

এর পর মিস মারপলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সর্বশেষ পরিকল্পনার কথাটা তাঁকে জানালেন।

সব শুনে ডাক্তার বললেন, প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ুক সেটা অবশ্যই আমি চাই। হতভাগা হসটার জন্যই আমি ভাবিত। জীবনটাকে কাপুরুষের মত উড়িয়ে দিল।

এর পর ইনসপেক্টর পরিকল্পনা মত যোগাড়যন্ত্র করতে তৎপর হয়ে পড়লেন। মিস মারপল উঠলেন। আমি তাকে এগিয়ে দেবার জন্য ফাঁকা রাস্তা পর্যন্ত বেরিয়ে এলাম। রাত তখন বারোটা।

.

২১.

এই গল্পের আর সামান্যই বাকি আছে। মিস মারপলের পরিকল্পনা যথাসময়েই কার্যকরী করা হয়েছিল এবং সফলও হয়েছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে লরেন্স রেডিং নির্দোষ ব্যক্তি নয়।

তাকে ফোন করে জানানো হয়েছিল যে হস-এর ক্যাসেটের ক্যাপসুল বদল করার ব্যাপারটা একজনের চোখে পড়ে গেছে। শুনেই, মিস মারপল যেমন বলেছিলেন, তেমনি বোকার মত একটা কাজ করতে এগিয়ে এসেছিল।

আমার কল্পনাশক্তি দিয়েই পরের ঘটনাগুলো কি হতে পারে বুঝতে পারি। ফোন পেয়েই লরেন্স খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। তবে তার আগে সে মিসেস প্রথেরোর সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করে।

সেই রাতেই ওল্ড হল-এ ছুটে যায় সে। সেই সময় ইনসপেক্টরের দুজন অফিসারও যে তাকে আড়াল থেকে অনুসরণ করে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না।

জানালা দিয়ে নূড়ি ছুঁড়ে মিসেস প্রথেরোকে জাগায় লরেন্স। ফিসফিসিয়ে তাকে বলে বাইরে আসার জন্য। লেটিসের জেগে থাকার ভয়ে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলাই নিরাপদ মনে করে।

তারা যখন বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, অনুসরণকারী অফিসার দুজন আড়াল থেকে সবই শুনে নিয়েছিল। মিস মারপলের প্রতিটি হিসেব এভাবেই মিলে গিয়েছিল।

এর পর লরেন্স রেডিং এবং মিস প্রথেরোর বিচার যথারীতি জনগণের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ওপ্রসঙ্গে আমি কিছু আর বলতে চাই না। আমি কেবল এটুকুই উল্লেখ করতে চাই যে এই মামলার সমস্ত কৃতিত্বটুকু দখল করেছিলেন ইনসপেক্টর মেলচেট। যার উৎসাহ আর বুদ্ধিমত্তা অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সুযোগ করে দিয়েছিল সেই মিস মারপলের ভাগ্যে কৃতিত্বের ছিটেফোঁটাও জোটেনি। এই ঘটনায় খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন মিস মারপল।

বিচারের ঠিক আগের দিন লেটিস এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আমার সামনে চেয়ারে বসে সে বলেছিল, সৎমায়ের এই অধঃপতনের কথা সে জানত। বলেছিল, আমি তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম।

আমি লেটিসকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখন কি করবে?

লেটিস শান্ত কণ্ঠে বলল, সব যখন শেষ হবে আমি বিদেশে চলে যাব। আমার মায়ের সঙ্গেই যাচ্ছি।

চমকে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। লেটিস বলল, আমার মা কে হতে পারে নিশ্চয় বুঝতে পারছ না তুমি? তোমরা যাঁকে মিস লেসট্রেঞ্জ বলে জান তিনিই আমার মা। সকলে জানে অবশ্য আমার মা মৃত। আমিও তাই জেনে এসেছি।

একমুহূর্ত থেমে সে আবার বলল, মা আমাকে দেখতে এসেছিল। সেজন্যই তাকে অন্য নাম দিতে হয়েছিল। ডাক্তার হেডক অবশ্য তাকে সাহায্য করেছিলেন। উনি মায়ের পুরনো বন্ধু ছিলেন। একসময়ে মায়ের প্রতি ডাঃ হেডকের দুর্বলতা ছিল।

যাইহোক, সেদিন রাতে মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। জানিয়েছিল, মরার আগে তার কিছু জিনিস আমাকে দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমার বাবা ছিল একটা জানোয়ার। বাবা পরিষ্কার বলে দিয়েছিল আমার ওপর তার কোন অধিকার নেই।

লেটিস থামল। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন কেতাবী গল্প শুনছি।

লেটিস বলতে লাগল, বাবা নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল মাকে। কিন্তু তবু ভেঙ্গে পড়েনি মা। আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। টেনিস খেলা শেষ হবার পর সাড়ে ছটায় আমি মার সঙ্গে রাস্তায় দেখা করলাম। কিন্তু বেশি কথা বলার সুযোগ ছিল না।

.

পরে বাবা খুন হবার পর ভীত হয়ে পড়লাম। বাবার প্রতি মায়ের তো একটা বিদ্বেষ ছিলই। সেই জন্য মাকে যাতে সন্দেহের মধ্যে পড়তে না হয় সেজন্য একদিন রাতে চিলেকোঠায় উঠে মায়ের ছবিটা এমনভাবে কেটেকুটে দিলাম যাতে কেউ চিনতে না পারে। আমার আশঙ্কা ছিল, পুলিস ওই ছবির খোঁজ পেলে তারা মাকে চিনে ফেলবে। ডাঃ হেডকও খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে থামল লেটিস। কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে। লেটিস বলতে লাগল মা আর আমার মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু তেমন সম্পর্ক

আমার বাবার সঙ্গে ছিল না। যাই হোক, আমি মায়ের সঙ্গে বিদেশে চলে যাচ্ছি, তার সঙ্গেই থাকব এখন থেকে।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল লেটিস। তার চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে উঠল। আমি তার হাত টেনে নিয়ে বললাম, ঈশ্বর তোমার মার মঙ্গল করুন। আশা করি তোমরা একদিন সুখী হবে।

–আশীর্বাদ করো তাই যেন হয়।

বলে লেটিস বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।